প্রাপ্তিস্থান ঃ

বেঙ্গল লাইব্রেরী

৮, গুলু ওস্তাগরের লেন, দর্জ্জিপাড়া,

কলিকাতা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য এক টাকা বার আনা।

ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেসে
শ্রীকিশোরীমোহন বাক্‌চি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৯, গুলুওস্তাগরের লেন,
কলিকাতা।

নিবেদন।

উদার ধর্ম্ম-ভাবের আসন যদি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, সংসারে তবে আর ভয় অথবা ভাবনার বিষয় কিছুই থাকে না। তার কাছে অত্যাচার, অবিচার শক্তিহীন—প্রলোভন বা মোহ সেখানে স্থান পায় না,—বিপদ দূরে সরিয়া পড়ে। "জয়-পতাকা"য় এ ভাবগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছি। চেষ্টা আংশিক ভাবে সফল হইলেও পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

নাগরনন্দী,
ঢাকা।
১লা আশ্বিন,
১৩২৮।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জয়-পতাকা

১

মৃত্যুর মধ্যে জীবনের বিকাশ যেমন মানবকে বিস্ময়ে নির্ব্বাক করিয়া দেয়, বিমাতা হেমলতার কঠিন প্রাণে করুণার ছায়া দেখিয়া রমাও তেমনি নির্ব্বাক হইয়া গেল।

রমার স্নেহের ভগিনী সুধা তিন দিনের জ্বরে শুষ্ক গোলাপ কলিটির মত বিছানায় পড়িয়া আছে।

একধারে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনিল।

একটা যেন বিষাদের ছায়া—একটা যেন বিরাট হাহাকার সে গৃহের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

হেমলতা সুধার বিছানায় বসিয়া বলিলেন, "এ কি দেখ্‌ছি রমা! তিন দিনে সুধা আমার এমন হ'য়ে গেছে! কই, আমাকে ত তেমন কিছু বল নাই?"

রমা বিমাতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল,—কথাগুলি

যেমন কোমল, মুখেও সে করুণার ভাব মাখানো নাই। এ যেন একটা অভিনয়—যাহা সত্য নয় তাহাই যেন প্রকৃত বলিয়া দেখানো হইতেছে।

রমার চক্ষু দু'টি জলে ভরিয়া উঠিল। বলিল, "সুধার অসুখের কথা বাড়ীর সকলেই ত জানে মা! সুধাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও আমি এখান থেকে উঠ্‌তে পারি না—কিন্তু সুধা বুঝি আর বাঁচে না।"

সুধার মাথায় হাত রাখিয়া হেমলতা বলিলেন, "অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই রমা! অসুখ সকলেরই হ'য়ে থাকে। বাবুকে চিঠি লেখা হ'য়েছে, বোধ হয় তিনি আজই আস্‌বেন। আমি একটু সাবু গরম ক'রে নিয়ে আসি। দেখ, যদি খাওয়াতে পার।"

হেমলতা যাইতেছিলেন।

বাধা দিয়া অনিল কহিল, "জীবনে যা'কে ছায়া মাড়াতে দেওনি, মৃত্যুতে কেন তা'কে একটু সাবু দিয়ে ঋণী ক'রে রাখ্‌তে চাও মা? তুমি তোমার কাজে যাও। অভাগিনী মাতৃহারা ভগিনীটি আমার—এত থাক্‌তেও তা'কে একজন ভাল ডাক্তার দেখান হ'লো না। কি এমন অপরাধ ক'রেছি মা, যে, এমন ক'রে প্রতিশোধ নিলে? বাবার কাছে তারের খবরটা পাঠাতে দিলে না—কলিকাতা থেকে ডাক্তার আন্‌তেও নিষেধ ক'রে দিলে। যাও মা, তোমার সাধ মিটেছে। সুধা আর থাক্‌বে না। আমাদের বুক ভেঙ্গে যাবে, আর একটু অন্তরালে গেলেই তোমার মুখে উল্লাসের হাসি ফুটে উঠ্‌বে।"

অনিলের প্রতি একটা জ্বালাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হেমলতা বলিলেন, "এত সাহস তোমার অনিল! আমাকে এমন ক'রে অপমান কর্‌বার অধিকার তুমি কোথায় পেলে?"

স্থির কণ্ঠে অনিল বলিল, "এই ত তোমার পরিচয় মা। তবে একটু পূর্ব্বে ও কি ভাব দেখাচ্ছিলে? হৃদয়ের খাঁটি ভাবটা কতক্ষণ চেপে রাখা যায়! সে যে আপনি ফুটে ওঠে।"

"আচ্ছা, দেখ্‌বো," বলিয়া একটা দম্‌কা বাতাসের মত হেমলতা সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ভীতিজড়িত কণ্ঠে রমা বলিল, "কি সর্ব্বনাশ ক'রলে দাদা? এমন ক'রে কেন মাকে গালাগালি দিলে? সুধা চলে যাচ্ছে! ছেলে বেলা থেকে মায়ের আদর পায়নি। আমি যে ওকে এই আট বৎসর বুকে ক'রে মানুষ ক'রেছি। দিন রাত কাছে কাছে থেকে আমি যে ওর সব আব্‌দার পেলে আস্‌ছি—নিজের হাতে খাইয়েছি, রাত্রিতে বুকে জড়িয়ে শুয়ে রয়েছি। ওকে ত এক দিনও বুঝ্‌তে দেই নাই যে, আমরা মাতৃহারা। কিন্তু দাদা, সব যত্ন যে আজ বিফল হ'তে চল্লো। এত যত্নের, এত আদরের বোন্‌টি যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের উপর শুকিয়ে গেল। তার উপর তুমি মাকে রাগিয়ে দিলে।"

অনিল একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "চুপ্‌ কর রমা, মা রেগে বেশী আর কি ক'রবে? সুধার প্রাণ আহুতি দিয়েও যদি মা'র ক্রোধ প্রশমিত ক'রতে না পারি, তবে না হয়—তোর আমার দু'জনের প্রাণই সে অনলে ছাই হ'য়ে যাবে।"

রমা সুধার মস্তকটি ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। অনিলকে একটু বেদানার রস করিয়া সুধার মুখে ঢালিয়া দিতে বলিল। পরে সুধার মুখের নিকট মুখ লইয়া কহিল, "লক্ষ্মী দিদিটি আমার, এই ঔষধটুকু খেয়ে নাও।"

অতি ক্ষীণকণ্ঠে সুধা উত্তর করিল, "না দিদি, আমি আর কিছু খাব না। মা হাত বাড়িয়ে আমাকে কোলে তুলে নিতে এসেছেন। আমি সেখানেই যাব। সে বড় ভাল জায়গা।"

গৃহদ্বারে শব্দ হইল, "রমা!"

রমা ফিরিয়া দেখিল। বাষ্পরুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "এতক্ষণে এলে তুমি মামাবাবু! দেখ তোমার সুধাকে। কই, বাবা ত এখনও এলেন না!"

"এই যে আমি রমা," বলিয়া শ্যালক যোগেশবাবুর সহিত বিজয়বাবু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রমা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "বুকের রক্ত দিয়েও যে সুধাকে রাখ্‌তে পারলুম না বাবা! আপনি একটু আগে এলে বোধ হয় সুধা বাঁচতো।"

দারুণ অবসাদে সুধা ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

বিজয়বাবু সুধার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন—সুধার চক্ষু দু'টি স্থির—অচঞ্চল। তিনি উভয় হস্তে নয়ন আবৃত করিলেন। যোগেশবাবু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সুধা ততক্ষণ সুখ দুঃখের অতীত স্থানে প্রস্থান করিয়াছে।

২

ঘুম পাড়ানিয়া মন্ত্রে যেমন বালকের চক্ষু মুদ্রিত হইয়া পড়ে—হেমলতার মুখে অনিল ও রমার অতিরঞ্জিত উদ্ধত স্বভাবের কাহিনী শুনিতে শুনিতে বিজয়বাবুর হৃদয়ে সন্তান-স্নেহের প্রবৃত্তি-গুলিও তেমনি নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

নবীনা হেমলতার নিকট প্রৌঢ় বিজয়বাবুর এ পরাজয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

হেমলতা বুঝাইলেন,—অনিল ও রমার সহিত এ বাড়ীতে থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। আজ সুধার মৃত্যুর জন্য তাহাকে দায়ী করা হ'য়েছে—কাল যদি অনিল বা রমার কিছু হয়, তবে যে তা'কে খুনী বলে বেঁধে দেওয়া না হ'বে, তা'রই বা নিশ্চয়তা কি?

বিজয়বাবু একটু বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "এ যে তোমার অসম্ভব প্রস্তাব হেম! অনিল ও রমার থাকবার মত স্থান এ বাড়ীতে যথেষ্ট আছে।"

হেমলতা বলিলেন, "অনিল ও রমা এ বাড়ীতে আছে, থাকুক্। আমাকে যেখানে হয় পাঠিয়ে দেও। পিসিমাকে খবর দিলেও তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন।"

হেমলতার স্বর অভিমান-দীপ্ত।

চিত্রকর যেমন তাহার চিত্রের আদর্শের প্রতি মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া

থাকে—আর ধীরে ধীরে সে আদর্শটি যেমন তাহার প্রাণময় হইয়া পড়ে—বিজয়বাবুও তেমনি ভাবে হেমলতার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা হেমলতার সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া গেল।

ঠিক এমনি সময়ে অনিল ও রমার সহিত যোগেশবাবু সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বিজয়বাবুর অবস্থা. দৃষ্টিমাত্রেই যোগেশবাবুর হৃদয়ঙ্গম হইল।

তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "অনিল ও রমা দিন কত আমাদের ওখানে থেকে আসুক। কয়েক দিন পরে আবার দিয়ে যাব।"

প্রস্তাবটা যোগেশবাবুর পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও বিজয়বাবুর প্রাণে একটা তীব্র কশাঘাতের ন্যায় বাজিল।

তিনি বলিলেন, "যোগেশবাবু, কেন তুমি সন্তান ও পিতার মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি ক'রে দিতে চাইছো?"

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে যোগেশবাবু কহিলেন, "এ কি কথা বলছো তুমি বিজয়বাবু, এ ব্যবধান আমি সৃষ্টি ক'রতে আসি নাই—সে যে তুমি অনেক দিন পূর্ব্বেই ক'রে রেখেছ।"

বিজয়বাবু একবার হেমলতার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—সে নশ্বর অঙ্গে সৌন্দর্য্যরাশি নদীবক্ষে জ্যোৎস্নার ন্যায় ক্রীড়া-পরায়ণ। বলিলেন, "হেমলতাকে গৃহে এনেছি ব'লেই না তুমি আমাকে এ অনুযোগ দিচ্ছ যোগেশবাবু? কিন্তু একবার যখন

গৃহে স্থান দিয়ে ফেলেছি, তখন ত আর এ'কে গলা টিপে তাড়িয়ে দিতে পারি না। তোমার যা অভিরুচি কর।"

অনিল একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্য এ বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র যাবার খুবই প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে বাবা! বড় অবহেলায়, বড় উপেক্ষায় সুধা আমাদের ছেড়ে গেছে। এ বেদনার দাগ্‌টা মুছে ফেলবার জন্যও কিছুদিন অন্যত্র থাক্‌তে হ'বে।"

একটু ক্রোধমিশ্রিত স্বরে বিজয়বাবু বলিলেন, "এর জন্য তুমি কা'কে দায়ী ক'রতে চাও?"

হৃদয়ের আবেগ দমন করিতে না পারিয়া অনিল বলিয়া উঠিল, সুধার মৃত্যুর জন্য দায়ী—মা আর—"

বিজয়বাবু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "দূর হ'য়ে যাও তুমি আমার কাছ থেকে—আমি তোমার মুখ দেখ্‌তে চাইনা।"

রমা কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার পদতলে পড়িয়া বলিল, "বাবা, বাবা, দাদাকে মাপ কর, বাবা! সুধার শোক সাম্‌লাতে না পেরে যা' বলবার নয় তাই ব'লে ফেলেছে। তুমি দাদাকে শাসন কর বাবা, ত্যাগ ক'রো না।"

গম্ভীর ভাবে বিজয়বাবু বলিলেন, "আমার কাছ থেকে এদের নিয়ে যাও যোগেশবাবু! এরা যেন আমার কাছে না আসে।"

"আচ্ছা, তাই হ'বে," বলিয়া যোগেশবাবু অনিল ও রমার সহিত চলিয়া গেলেন।

হেমলতার দিকে চাহিয়া বিজয়বাবু বলিলেন, "আমাকে একটু নিরিবিলি থাকতে দেও, হেম !"

বিজয়বাবুর মুখের ভাব দেখিয়া হেমলতা কোন উত্তর করিতে সাহস করিলেন না। তিনি নীরবে গৃহ ত্যাগ করিলেন।

৩

অনিল ও রমাকে মাতার কাছে রাখিয়া যোগেশবাবু বলিলেন, "কাঁধে ক'রে নিয়ে এসেছি ব'লে কেউ যেন এদের বোঝা মনে না করে মা! একটা তীব্র দহনের জ্বালা এখনও এদের প্রাণে জেগে আছে—দেখো, কেউ যেন সে জ্বালা বাড়িয়ে না দেয়!"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া যোগেশবাবু চলিয়া গেলেন।

শিথিল হস্ত প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধা আনন্দময়ী অনিল ও রমাকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, "এসো দাদা, আয় দিদি, এ বুড়ীর বুকের আড়ালে দিন কত ঠাণ্ডা হ'য়ে থাক্। বড় ব্যথা পেয়েছিস তোরা। তোদের মা গেছে—ছোট বোনটি গেল। কিন্তু তোদের মায়ের মা যে পাষাণীর মত স্থির হ'য়ে বসে আছে।"

বৃদ্ধার নয়নে ধারা বহিল।

রমা দিদিমার গলাটি জড়াইয়া বুকের মধ্যে মুখ রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "আমরা যে আজ সব হারিয়ে, একেবারে নিঃস্বর মত তোমার বুকে আশ্রয় নিতে এসেছি দিদিমা!"

মুখ তুলিয়া রমা দেখিল—বাড়ীর সমস্ত লোক তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। অতগুলি উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া রমা যেন কেমন সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল।

মামী বিন্দুরাণী কাছে আসিয়া বলিলেন, "যা' শুন্‌ছি, সত্যি নাকি সে সব কথা রমা? সং-মার কথা ছেড়ে দিলেও চলে, কিন্তু বাপ যে তা'র ছেলে মেয়েকে এমনি ধারা পর ক'রে দিতে পারে, তা'তো আর শুনিনি।"

সকলের দৃষ্টিতে, সকলের কথায় যেন অনিল ও রমার প্রতি একটা অনুগ্রহের আর বিজয়বাবুর প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

এ দৃশ্যের মধ্যে রমা একেবারে হাঁপাইয়া পড়িল।

অনিল এ রকমটা একেবারেই পছন্দ করিল না। অতি কষ্টে প্রাণের আবেগ দমন করিয়া কহিল, "আমি একটু বাইরে যাই, রমা!"

রমা ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া সব বুঝিল। দেখিল—যেন অনিলের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতেছে।

অনিলের হাত দু'খানি ধরিয়া রমা বলিল, "স্থির হও দাদা, তুমি যদি এমন কর, তবে আর আমি বাঁচ্‌বো না।"

মূর্ত্তিমতী করুণার ন্যায় মাসিমা সরযূ রমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কি মধুর সে দৃষ্টি! দেখিয়াই রমার প্রাণে তাহার বহুদিন বিস্মৃত মাতৃ-মূর্ত্তির অনুরূপ ছবি ফুটিয়া উঠিল।

অনিল বলিল, "রমা, আমাদের এখানে থাকাটা এখানকার লোকের বড়ই অনুগ্রহের দান ব'লে বোধ হ'চ্ছে। এখানে না এলেই কি হ'তো না?"

রমা উত্তর করিল, "চেয়ে দেখ দাদা, একবার মাসিমার মুখের দিকে! তা'রপর যা' ইচ্ছে ব'লো।"

অনিল সরযূর প্রতি চাহিল। এ যে এক বিগলিত করুণায় মাখা দেবীপ্রতিমা! অনিল মুগ্ধনেত্রে অনেকক্ষণ সে দিকে চাহিয়া রহিল। পরে সরযূর পাদু'খানি ধরিয়া বলিয়া ফেলিল, "এত লোকের মাঝখান থেকে যে এতক্ষণ তোমায় ঠিক খুঁজে বা'র ক'র্‌তে পারি নাই মাসিমা! মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেছে, মাপ ক'র্‌বে কি?"

সরযূ অনিলের হাত ধরিয়া উঠাইলেন। বলিলেন, "অবুঝ ছেলের কথায় মা কি কখনও রাগ করে রে পাগল!"

বিন্দুরাণী একধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। সরযূর প্রতি অনিলের এ ভক্তির ভাবটা যেন তাঁহার বেশী ভাল লাগিল না। বলিলেন, "এর মধ্যে তোমায় ত আর কেউ কোন অন্যায় কথা বলেনি অনিল! তবে কেন তুমি এসব কথা বল্‌ছো?"

রমা কাতরভাবে কহিল, "দাদার কথায় কান দিয়ো না মাসিমা!"

যাইতে যাইতে বিন্দুরাণী ভাবিলেন,—ছেলেটী বড় সোজা নয়, মেয়েটিও যেন সাক্ষাৎ মায়াবিনী!

পুত্র বরেনকে বলিলেন, "এখানে আর দেরী করিস্‌ নে, আয় আমার সঙ্গে।"

বরেন মাতার কথায় কর্ণপাত না করিয়া অনিলের হাতখানি ধরিয়া কাছে দাঁড়াইল।

৪

স্থির নদীবক্ষে প্রতিফলিত চন্দ্রের শান্ত ছবিখানি যেমন বায়ুর তাড়নায় উদ্বেল হইয়া ওঠে, নন্দনপুর জমীদার বাড়ীখানাও তেমনি মিঃ হীরালালের আগমনে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

বিন্দুরাণীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হীরালাল বিলাত গিয়াছিলেন, হাকিম হইয়া ফিরিবেন আশা করিয়া। কিন্তু ফিরিয়া আসিলেন পর কেহই ঠিক বুঝিতে পারিল না যে, তিনি কি হইয়া ফিরিয়াছেন।

অল্প কয়েকদিন যাবৎ তিনি ভগিনীর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন।

সস্ত্রীক যোগেশবাবু সাহেবিয়ানাটা খুবই ভালবাসেন।

সহস্র গুণের মধ্যেও যোগেশবাবুর চরিত্রে একটা দোষ পরিস্ফুট ছিল। তিনি যে কাজ একবার ভাল বলিয়া মনে করিতেন, সেই কাজের সম্মুখে সহস্র বিঘ্নকেও গ্রাহ্য করিতেন না। অনুষ্ঠিত কার্য্যে কেহ দোষ দেখাইয়া দিলে তাঁহার রাগ হইত এবং সেই কার্য্য সাধনে জেদ্ আরও বাড়িয়া যাইত। দেশীয় অধিকাংশ জমীদারের ন্যায় নিজের সদ্বিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তার উপর তাহার প্রবল বিশ্বাস ছিল। কাজেই যোগেশ বাবুর প্রতি কার্য্যেই একটা অহঙ্কারের ভাব পরিলক্ষিত হইত। সাহেবি-চালচলনের প্রতি অনুরাগ ও দেশীয় জমীদারের

স্বাভাবিক অহঙ্কারের মিশ্রনে যোগেশবাবুর চরিত্র সময়ে সময়ে বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইত।

যোগেশবাবুর বাড়ীখানা দুইটি মহলে বিভক্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাতা আনন্দময়ী বিধবা কন্যা সরযূর সহিত একপ্রকার পৃথক ভাবেই বাস করেন। সরযূ বাল-বিধবা। ধনী-গৃহেই সরযূর বিবাহ হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর সরযূ স্বামী-পরিত্যক্ত বিপুল অর্থরাশি সঙ্গে লইয়া মাতার নিকটেই বাস করিতেছেন। যোগেশবাবুর রুচির সহিত ইহাদের রুচির অনৈক্যই এই পৃথক্ ভাবে অবস্থানের একমাত্র কারণ।

হীরালাল বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, কাজেই সাহেবি ধরণে একটা আমোদের সৃষ্টি করিয়া তুলিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি একটা পারিবারিক অভিনয়ের আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। জমীদার বাড়ীর মেয়েরাও সে অভিনয়ে যোগ দিবেন।

যোগেশবাবু আগ্রহের সহিতই এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

অদ্য তাঁহার উপরের বৈঠকখানায় মিঃ হীরালালের বৈঠক বসিয়াছে।

বিলাতপ্রত্যাগত ডাক্তারসাহেব মিঃ মুখার্জি, পত্নী শ্রীমতী বেলা ও ভগিনী লীলার সহিত এ অভিনয়ে যোগ দিয়াছেন।

শ্রীমতী বেলাকে মিঃ হীরালাল বড়ই পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বরেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ভারতবর্ষে এমন রমণীর আদর্শ থাকতে পারে, শ্রীমতী বেলাকে না দেখলে

আমার তা' বিশ্বাসই হোত না। পূর্ণ বিকশিত গোলাপ ফুলটির মত কেমন সকলের প্রাণে আনন্দ ঢেলে দিচ্ছেন, দেখ দেখি! সঙ্গে ব'সে কথা কও—প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। গান বাজনা কর, হৃদয়টা কল্পনাময় সুখের রাজ্যে ঘুরে বেড়াবে।"

বরেন বলিল, "লীলাকে গাইতে বলুন মামা বাবু, বড় মিষ্টি-তার গানগুলি।"

হীরালাল বলিলেন, "লীলার গান খুবই ভাল হ'বে। এখন যত ভাবনা হ'চ্ছে বনদেবীর গান নিয়ে।"

বরেন বলিল, "রমাকে দিয়েই—সে গান চল্‌বে। আমি তা'কে ডেকে পাঠিয়েছি। অই যে রমা আস্‌ছে।"

রমা আসিতেই তাহার হাতখানি ধরিয়া বরেন বলিল, "এত দেরী কর্‌লি কেন রমা! আমরা যে সব তোর পথ চে'য়ে আছি। তোকে "বনদেবী" হ'তে হ'বে। তিনটে গান আর গোটাকত কথা। তা' তুই বেশ পার্‌বি।"

রমা। এ কাজের জন্যই যদি আমায় ডেকে থাক দাদা, তবে আমাকে না ডাকাই ভাল ছিল।

বরেন বড়ই অপ্রস্তুত ভাবে একধারে সরিয়া দাঁড়াইল।

বিন্দুরাণী কহিলেন, "কেন রমা, এ'তে কি কিছু ভয়ের কারণ আছে? একটা সখের কাজে তোকে ডাকা হ'য়েছে, অমনই বা করিস্ কেন?"

রমা। আমাকে মাপ কর মামি-মা! অভিনয় কর্‌বার শক্তি আমার নেই। বিশেষ এ কাজটা আমি তেমন পছন্দ করি না।

বিন্দুরাণীর বড়ই রাগ হইল। বলিলেন, "যে কাজে আমরা সকলে হাত দিয়েছি, তা'তে তোরই বা এমন অপছন্দ কেন ?"

মুখখানি নত করিয়া রমা উত্তর করিল, "পছন্দ অপছন্দ ত সকলের এক রকমের নয় মামি-মা। অভিনয়ে যোগ দিতে ত আমি পারবই না। আর আমি এ কাজটাকে বিশেষ অন্যায় বলেই মনে করি।"

বিন্দুরাণী। এখন দেখ্‌ছি ন্যায় অন্যায় তোর কাছে শিখ্‌তে হ'বে। বিজয়বাবুকে দোষ দিয়েছি মিছে। এমন কাটা কথায় কার মনে কে জায়গা পায় ?

রমার বিস্তৃত নয়নদুটি জলসিক্ত হইল।

বিন্দুরাণী রমাকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার বলিলেন, "এমন ক'রে আমাদের অপমান না করলেই কি তোর চল্‌তো না ? এই ঘর শুদ্ধ লোকগুলোকে তোর মত এক ফোটা একটা মেয়ের কাছে—ন্যায় অন্যায় শিখ্‌তে হ'বে ? তুই নিজেকে যে কি মনে করিস্ রমা, তা' তুই-ই জানিস্।"

রমা। ভিখারীর মত দুটি ভাই বোন তোমাদের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি, আমি আর নিজেকে কি মনে ক'রতে পারি মামি-মা ?

বিন্দুরাণী। কথায় ত তা' বোঝায় না। মনে হয় যেন তুই সকলকে শাসন করতেই এসেছিস্।

অঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিতে করিতে রমা বলিল, "পায়ের তলায় যে পড়ে আছে, তা'কে পদদলিত ক'রে তোমার আর কি গৌরব বাড়্‌বে বল।"

রমা ধীর-পদবিক্ষেপে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বাহিরে আসিয়া রমার হাত দু'খানি ধরিয়া বরেন বলিল, "তোকে এখানে ডেকে এনে ভারি অন্যায় করেছি রমা! এ দোষ সব আমার। বল্ রমা, মায়ের কথা সব ভুলে যাবি। আমার দিকে চেয়ে এ প্রতিজ্ঞা তোর কর্‌তেই হ'বে। তোর বুকে যে ব্যথা না লেগেছে—তোর অপমানে আমার বুকে তা'র হাজার গুণ বেশী লেগেছে। লজ্জায় যে আমি তোর দিকে চাইতে পারি না রমা!"

রমা। তোমার কি দোষ দাদা! ছেলেবেলা থেকে আমি সইতে শিখেছি। এ আঘাতটাও অসহ্য হ'বে না।

বরেন। এমন ক'রে মা তোর প্রাণে আঘাত কর্‌বে জান্‌লে তোর কথা এখানে উঠ্‌তেই দিতাম না। বল রমা, সব ভুলে গেলি।

রমা। না ভুলে ত উপায় নেই দাদা। আর যদি বা উপায় থাক্‌তো, তোমার কথায় তবুও ভুলে যেতাম।

বরেন। চল, তোকে ঠাকুরমার ঘরে রেখে আসি। এসব কথা আর কাউকে বলিস্‌নি রমা!

উভয়ে আনন্দময়ীর গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

৫

মিঃ হীরালাল বেলাকে বলিলেন, "দেখেছেন একবার এ দেশের মেয়েদের অবস্থাটা! যেন সব প্রাণহীন পুতুল। কি বৈষম্য আপনার সঙ্গে!"

প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে হীরালাল বেলার দিকে চাহিলেন।

বেলা কহিলেন, "লজ্জা জিনিষটা বাস্তবিকই স্ত্রী-জাতির ভূষণ, কিন্তু সেই লজ্জার খাতিরে আমরা যে কোন কাজেই যোগ দিতে পারবো না—সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবো—এ বড অন্যায় ব্যবস্থা।"

উৎসাহের সহিত হীরালাল বলিলেন, "কিন্তু এ দেশের নিয়মই তাই। স্ত্রী-জাতিটা আছে যেন পতনের মুখে পা' বাড়িয়ে। পুরুষেরা পাহারার মত তা'দের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ্‌বে যেন তা'রা পা' পিছ্‌লে প'ড়ে না যায়।"

বেলা কহিলেন, "শুধু এ দেশেই স্ত্রী-জাতিটাকে এমনি হীন ক'রে রাখা হ'য়েছে। কোন শক্তি নেই—নিজের উপর নির্ভর মাত্র নেই। হৃদয় যা'র পবিত্র—মুক্ত বাতাস তা'র সে পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে না। পুরুষের সাধ্য কি সে পবিত্র জ্যোতির সম্মুখে কলুষিত বাসনা হৃদয়ে পোষণ ক'রে এসে দাঁড়ায়? কিন্তু অপবিত্র হৃদয় রুদ্ধ-গৃহ-কোণেও পবিত্র থাকতে পারে না।"

হীরালাল দেখিলেন—শ্রীমতী বেলার নয়নে বদনে যেন

একটা উজ্জ্বলপ্রভা—একটা তেজোময় দীপ্তি—একটা পুণ্যের তীব্র আলোক।

সে জ্যোতিতে হীরালালের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। তিনি আর সে দিকে চাহিতে পারিলেন না।

ততক্ষণ লীলা গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে মধুর সঙ্গীতে সমস্ত গৃহখানি সুধাময় হইয়া উঠিল।

অতিরিক্ত গরম পড়িয়াছে। হীরালাল বেলাকে কহিলেন, "বাহিরের বারাণ্ডায় বসিলে একটু বাতাস পাওয়া যেতে পারে। চলুন্ না সেখানে?"

"আচ্ছা, চলুন্", বলিয়া বেলা উঠিলেন।

বারাণ্ডার সম্মুখেই পুষ্পোদ্যান। শুভ্র জ্যোৎস্নায় সমস্ত জগৎ আলোকিত। বাহিরে আসিয়া বেলা একটু আরাম বোধ করিলেন।

হীরালাল বলিলেন, "এই জ্যোৎস্নার মত প্রাণ নিয়ে মানুষ যদি সংসারে থাক্‌তে পার্‌তো, তবে—"

বেলা হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন, "এ যে কবিতা আরম্ভ কর্‌লেন, মিঃ হীরালাল?"

হীরালাল উত্তর করিলেন, "কবিতা বড় কোমল। বিশেষ এই জ্যোৎস্নালোকিতা, কুসুম-হাস্য পরিশোভিতা ধরিত্রীর এই উৎসবময় রজনীতে—"

বেলা উঠিয়া বলিলেন, "মাপ কর্‌বেন মিঃ হীরালাল, কবিতাটা আমি তত ভালবাসি না। অই লীলার গান শেষ হল। চলুন ওদিকে যাই।"

বেলা অগ্রসর হইলেন।

হীরালাল যেন লজ্জায় একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন।

বেলা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "হারমনিয়মে আপনার হাতটি যে বড় খাসা, বরেন বাবু!"

লীলা বলিল, "কি সুন্দর বাজান উনি বউদি, আমার গাইতে লজ্জা হয়।"

মিঃ হীরালাল ও মিঃ মুখার্জ্জি একত্রে ধূমপান করিতেছিলেন। বেলা একবার সেখানে বসিলেন। পরে উঠিয়া বিন্দুরাণীকে বলিলেন, "অনেক রাত হ'য়েছে আজ! লীলাকেই কাল দিনের বেলা আমি ঠিক বনদেবী করে গড়ে তুল্‌বো। লীলার অংশ অন্য কাউকে দিলেই চল্‌বে।"

বিন্দুরাণী কোন উত্তর করিলেন না। সে রাত্রির মত বৈঠক ভাঙ্গিল।

৬

নন্দনপুরের প্রান্তদেশে জগদীশ আচার্য্যের কুটীর। কন্যা দীপ্তি ও তৃপ্তি এবং পুত্র শচীন্দ্রকে লইয়াই তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার।

দীপ্তি বিধবা, তৃপ্তি কুমারী এবং শচীন্দ্র অবিবাহিত।

পত্নী-বিয়োগের পর দীপ্তির চিন্তা আচার্য্যের সমস্ত হৃদয়-খানি জুড়িয়া আছে।

একটা কঠোর সাধনার মত দীপ্তির শিক্ষায় তিনি সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিয়াছেন।

দীপ্তির শিক্ষা পূর্ণ হয় নাই বলিয়াই চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত তৃপ্তি অবিবাহিতা। সেই কারণেই দ্বাবিংশবর্ষীয় শিক্ষিত যুবক শচীন্দ্রনাথের বিবাহের নাম পর্য্যন্তও করা হয় নাই।

আচার্য্যের কুটীরে আসিলে সন্ন্যাসীর আশ্রম বলিয়া ভ্রম হয়। বিলাস-বিভ্রমের রেখাটি পর্য্যন্ত চক্ষে পড়ে না। প্রাচুর্য্যের চিহ্নমাত্র নাই। সংযত ব্যবস্থায় আশ্রমটি যেন সংযমের লীলাক্ষেত্র।

মাতা পিতা ও আত্মীয়বর্গই বাল-বিধবার ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। ইহারা সকলেই বিধবা কন্যাকে সংযমের কঠোর নিয়মে বাঁধিতে চেষ্টা করেন—কিন্তু সংযত শিক্ষায় বিধবার হৃদয়টাকে মার্জ্জিত করিতে ত কেহ যত্ন করেন না। ইঁহাদের ব্যবহারে সে বিধবা ত' সংযমের এমন কোন আদর্শ পায় না, যাহা অবলম্বন করিয়া সে তাহার জীবনকে গড়িয়া তুলিতে পারে!

মনে হয় অধিকাংশ অভিভাবকই বুঝি শক্তিহীন। তাঁহারা চিরাভ্যস্থ বুলি আওড়াইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্যের শেষ করিয়া ফেলেন।

আচার্য্য মহাশয় এ কথাটা খুব ভাল রকমই বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি দীপ্তির সম্মুখে আপনাকে এমন ভাবে স্থাপন করিলেন যে, আদর্শের জন্ম দীপ্তিকে আর কষ্ট পাইতে হইল না।

নিয়ত এ মূর্ত্তিমান আদর্শ চক্ষুর সম্মুখে থাকায়, দীপ্তি ধীরে ধীরে আপনাকে সেই ভাবে গড়িয়া তুলিল।

দীপ্তি ও তৃপ্তি আচার্য্যের পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছিল।

আচার্য্য বলিলেন, "সৌন্দর্য্যে অনুরাগ মানবের স্বভাব। তাই এক অজ্ঞাত শক্তিবলে মানব-প্রাণ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে। কিন্তু যে সৌন্দর্য্যের আবির্ভাবে প্রাণের মধ্যে উৎকট বাসনা জেগে ওঠে, ভোগেই যা'র প্রাণ প্রতিষ্ঠা—সে বাসনাময় ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্য-স্পৃহা মানবকে কুপথে চালিত ক'র্‌বার প্রলোভন মাত্র। কিন্তু যে সৌন্দর্য্য প্রাণের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার ক'রে দেয়, হৃদয়ের পঙ্কিল ভাবগুলিকে দূর ক'রে চিত্তের শুদ্ধি সাধন করে—সেই সৌন্দর্য্যই জগতের শিক্ষক—মানবের গুরু। বাহিরের নয়নে এ সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে না। কেবল অনুভব ক'র্‌তে হয়। এ সৌন্দর্য্যে একবার মুগ্ধ হ'লে সে স্বপ্ন আর ভাঙ্গে না। যুগ-প্রলয়েও সে মাধুরী প্রাণের মন্দিরে বিরাজ করে।"

দীপ্তি। সংসারে এমন সৌন্দর্য্যের উপাসক কয়জন বাবা? কিন্তু যাঁরা আছেন, সার্থক জীবন তাঁ'দের।

আচার্য্য। সাধারণ মানবের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান অতি অল্প; নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপরিষ্কৃত কাঁচ খণ্ডে যেমন প্রতিবিম্বিত জিনিষের খাঁটি পরিচয় পাওয়া যায় না, কলুষিত হৃদয়ের মধ্যেও তেমনি প্রকৃত সৌন্দর্য্যের পূর্ণ ছবি ফুটে ওঠে না। সৌন্দর্য্য, ভালবাসা দুই-ই পবিত্র। কলুষিত হৃদয় সে সৌন্দর্য্যের বা ভালবাসার পবিত্রতা রক্ষা ক'রতে জানে না—পারে না।

দীপ্তি। পবিত্র ভালবাসা ভক্তি ভিন্ন আর কিছুইত নয় বাবা?

আচার্য্য। ঠিক তাই। হৃদয়টাকে প্রশস্ত ক'রে যদি মানুষ ভালবাসতে শেখে, তবেই সে এ বিশ্বনিহিত মহাপ্রাণের সহিত আপনার প্রাণটাকে মিশিয়ে দিতে পারে। তখন সে একজনের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হ'য়ে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সেবক হয়। তখনই তা'র প্রাণ সুধাময় হ'য়ে পড়ে—ভালবাসা ভক্তিতে পরিণত হয়—প্রেমের তরঙ্গে প্রাণমন ভেসে বেড়ায়। সে যে কি শান্তি মা, তা' অনুভব ভিন্ন বোঝান যায় না।

দীপ্তি। ভালবাসার পরিণতি যে ভক্তি সে কথা আমি এখন বেশ অনুভব ক'রতে শিখেছি বাবা!

আচার্য্য। তা' শিখবে বই কি মা! একনিষ্ঠ সাধনার সিদ্ধি অনিবার্য্য।

দীপ্তি। বেলা হ'য়েছে; এখন আপনি পূজায় বসুন বাবা!

আচার্য্য। আজ সন্ধ্যার পর গীতার তৃতীয় অধ্যায়টা তোমাদের শোনাব।

আচার্য্য পূজায় নিযুক্ত হইলেন। এমনি করিয়াই আচার্য্য মহাশয় দীপ্তিকে শিক্ষা দিতেন। আর তৃপ্ত নীরবে বসিয়া শুনিত।

পূজাগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়াই দীপ্তি শচীনের গলা শুনিতে পাইল।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটু চঞ্চল ভাবে শচীন বলিল, "এদিকে একবার আয়তো দীপ্তি, একটা লোক বোধ হয় মারা যায়, দেখি যদি বাঁচাতে পারি।"

দীপ্তি দেখিল, দারুণ প্রহারে মৃত প্রায় একটি অর্দ্ধ বয়স্ক বলিষ্ঠ লোক একজন অপরিচিত যুবকের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছে। সর্ব্বাঙ্গ তা'র রুধির-সিক্ত।

দীপ্তি জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে দাদা? এমন ক'রে কেই বা একে মেরেছে?"

শচীন উত্তর করিল, "দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার---এ তো নূতন নয় দীপ্তি। একটু দুধ গরম ক'রে নিয়ে আয়, আমি আর অনিল ততক্ষণ ওর গায়ের ঘাগুলি বেঁধে দি।"

দীপ্তি জিজ্ঞাসা করিল, "অনিল কে, দাদা?"

শচীন বলিল, "এখন ও ঠিক জানি না। তবে বেশ বুঝেছি, এ আমার পরম মিত্র, প্রাণের সুহৃদ্। যোগেশ বাবুর হ'য়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার ক'রেছিল ব'লে হরিকে আজ আধমরা ক'রে ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে। অনিল একে কাঁধে ক'রে বাড়ী নিয়ে চ'লেছিল। পথে আমার সহিত অনিলের পরিচয়।"

দীপ্তি অন্য কিছু না বলিয়া দাদার আদেশ পালন করিতে গেল।

শচীন ও অনিলের শুশ্রূষায় হরি একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "গিন্নি মা যদি দয়া না কর্‌তেন, তবে আর আজ আমার প্রাণ থাক্‌তো না ; কিন্তু বাবুকে আজ বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি, হরে চাষা হ'লেও প্রাণের চেয়ে ধর্ম্মটাকে বেশী ব'লে মানে।"

দীপ্তি আসিয়া হরিকে একটু দুগ্ধ পান করাইল।

শচীন কহিল, "কে তুমি ভাই, আজ এ দেবমূর্ত্তি নিয়ে আমার চোখে এসে দাঁড়ালে ?"

অনিল। আমাদের বাড়ী মহেশনগর। বিজয়লাল চৌধুরী আমার পিতা।

শচীন। তোমাকে ছেলেবেলা দু' একবার দেখেছি। অনেক দিন হ'য়ে গেছে তাই প্রথমে ঠিক চিন্‌তে পারি নাই। হরির সঙ্গে তুমি কেমন ক'রে এলে ?

অনিল। এ লোকটার প্রাণ প্রায় গিয়েছিলো আর কি ! দিদিমা আর মাসিমা টের পেয়ে একে রাস্তায় এনে দেন। একলা পথে হাঁটতে গেলে নিশ্চয়ই ও পড়ে মরে যাবে মনে ক'রে আমি ওর সঙ্গে বেরিয়ে আসি। তারপরই তোমার সঙ্গে দেখা।

শচীন। ঠিক মানুষের মত কাজই তুমি ক'রেছ অনিল। মানুষের দুঃখ দূর ক'রতে মানুষ যদি চেষ্টা না করে, তবে ত সে পশুরও অধম। দীপ্তি অনিলকে একবার বাবার কাছে নিয়ে যা'। আমি ততক্ষণ হরিকে তা'র বাড়ীতে রেখে আসি।

৭

অনিল ও রমাকে বিদায় করিয়া হেমলতা যেন একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। আর ত কাহাকেও সঙ্কোচ করিয়া চলিতে হইবে না!

নবীন বয়সে প্রাণে অনন্ত সাধ।

সন্তানের চক্ষের উপর প্রৌঢ় বিজয়বাবুর অগাধ প্রণয়, পূর্ণ মাত্রায় তিনি উপভোগ করিতে পারিতেছিলেন না। এখন সমস্ত অন্তরায় বিদূরিত হইল।

রূপমুগ্ধ বিজয়বাবুকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে যথেচ্ছ চালনা করিবার শক্তি যে হেমলতার আছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। হেমলতা এ সুযোগ ত্যাগ করিলেন না।

হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলির বাঁধন যদি একবার আল্‌গা করিয়া দেওয়া হয়, তবে সেগুলিকে চাপিয়া রাখা দায় হইয়া ওঠে। হেমলতার সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিল। হেমলতা বিলাস-সাগরে ডুবিলেন।

উচিত অনুচিত বিবেচনা না করিয়া বিজয়বাবু হেমলতার সমস্ত প্রার্থনাই পূর্ণ করিতেন। সুন্দরী যুবতীর আদেশপালনেও বুঝি বড় সুখ। বিজয়বাবু সে সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

হেমলতার গৃহখানি উৎকৃষ্ট বিলাসের উপকরণে সজ্জিত হইল। সঙ্গীতে চির দিনই বিজয়বাবুর অনুরাগ ছিল। হেমলতার ও সে শিক্ষা আরম্ভ হইল।

অনিল ও রমার প্রস্থানটা বিজয় বাবুর প্রাণে খুবই আঘাত করিয়াছিল। তিনি হেমলতার রূপের আড়ালে দাঁড়াইয়া বৃথা সান্ত্বনায় প্রাণটাকে স্থির করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন।

প্রথম জীবনের লীলা-চঞ্চল প্রবৃত্তিগুলিকে আবার চেতন করিয়া অসাধ্য সাধনের ব্যর্থ প্রয়াস অনেক সময় বিজয়বাবুকে নিজের কাছেই হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতেছিল।

৮

বিজয়বাবুর প্রাণে হেমলতার সৌন্দর্য্য এমনি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল যে, তিনি মনে করিতে লাগিলেন, হেমলতার সঙ্গলাভই যেন ভূতলে স্বর্গসুখ—সংসারে এমন বুঝি আর কিছুই নাই। এ ক্ষণস্থায়ী মোহমাখা সৌন্দর্য্য-স্পৃহা বিজয়বাবুকে অন্ধের ন্যায় টানিয়া এক অজ্ঞাত পথে লইয়া চলিল।

হেমলতাও অত্যধিক আদরে আপনাকে ভুলিয়া গেলেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার সুখসম্ভোগ পূর্ণ করিবার জন্যই ভগবান বিজয়বাবুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এ কর্ত্তব্য ভিন্ন বিজয়বাবুর বুঝি অন্য কাজ নাই।

এমনি ভাবেই দিন চলিতে লাগিল।

বিজয়বাবু ও হেমলতার বয়সের তারতম্য জনিত অভাবটা প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রণয় প্রকাশ করিয়া বিজয়বাবু পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

বিজয়বাবুর অপরিমিত অর্থরাশি—সমস্ত প্রাণঢালা অনুরাগ হেমলতার মনস্তুষ্টির জন্য অর্পিত হইল।

সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নালোকিত গবাক্ষ সমীপে বসিয়া বিজয়বাবু হারমোনিয়ম বাজাইতেছেন আর হেমলতা গাহিতেছেন।

সুগন্ধি-কুসুম-মাল্য-শোভিত হেমলতার মোহিনী মূর্ত্তি, তাঁহার স্বাভাবিক সুকণ্ঠনিঃসৃত মধুর ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত, তাঁহার নয়ন

বদনের আদরমাখা প্রফুল্লভাব সমস্তই যেন বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া বিজয়বাবুর বিশ্বাস হইল।

বিজয়বাবু কহিলেন, "হেম, তোমাকে পেয়ে মনে হচ্ছে যেন আমার মত ভাগ্যবান, আর কেউ এ পৃথিবীতে নেই। যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হ'তো, তবে বুঝি আমার জীবনের এ অসম্পূর্ণ ভাগ কেহ পূর্ণ ক'রতে পারতো না।"

হেমলতা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "আর আমার কি হ'তো বল ত'?"

বিজয়। হয় তো তুমি এর চেয়ে অনেক বেশী সুখী হ'তে পারতে।"

হেমলতা অভিমানের সহিত বলিলেন, "এর চেয়ে বেশী সুখের আশা ত আমার নেই। এ সুখই যেন আমার চিরদিন বজায় থাকে।"

বিজয়বাবুকে অন্য কথা বলিবার অবসর না দিয়া হেমলতা সোহাগ-মাখা স্বরে গান ধরিলেন। রূপমুগ্ধ বিজয়বাবু নীরবে এ স্বর সুধা পান করিতে লাগিলেন।

হেমলতা কহিলেন, "তুমি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হ'য়ে কি ভাবো বলতো?"

বিজয়। তুমি ছাড়া ত এখন আমার অন্য কিছু ভাববার বিষয় নেই হেম! তোমার রূপ—তোমার মধুর কণ্ঠই যে কেবল আমি দেখি আর শুনি।

হেম। আমায় ঠাট্টা করা হ'চ্ছে বুঝি? আমার বেশী রূপ

নেই—গাইতে আমি ভাল পারি না—সে কথাইতো এম্‌নি ক'রে ঘুরিয়ে বল্‌ছো ?

বিজয়। না হেম, ঠাট্টা নয়। এর চেয়ে খাঁটি সত্য আর আমার নেই।

হেম। আজ একটা নূতন গান শিখেছি—সে গানটা এখনও তোমাকে শোনাইনি। গাইব ?

বিজয়। তোমার কষ্ট না হ'লে ত আমার অসাধ নেই।

হেমলতা বিজয়বাবুর অঙ্কে মস্তক রাখিয়া গাহিতে লাগিলেন। স্বরের সঙ্গে সঙ্গে হেমলতার মুখের সঙ্কোচন প্রসারণ বিজয়বাবুর চক্ষে বড়ই মধুর বোধ হইতে লাগিল।

তিনি মনে মনে ভাবিলেন—কেমন করিয়া এ সুখ চিরস্থায়ী হয়।

৯

বিষয়কার্য্য পরিদর্শনের জন্য বিজয়বাবুকে মধ্যে মধ্যে বাহিরে থাকিতে হইত। সেই নিঃসঙ্গ অবস্থাটাকে হেমলতা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া মনে করিতেন। শীঘ্রই একটা উপায় হইল। হেমলতার পিত্রালয়ে তাঁহার এক পিসি ও দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র বাস করিত। হেমলতা অনেক চিন্তার পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে কাছে আনাইলেন। নাম তার বিমল,—ত্রয়োদশ বৎসরের সুন্দর বালক।

হেমলতা বিজয়বাবুকে ধরিয়া বসিলেন—"ভায়ের ছেলেটিকে যখন কাছে এনেছি, তখন এঁকে মানুষ ক'রে দিতে হবেই।"

বিজয়বাবু কহিলেন, "একজন ভাল দেখে মাষ্টার রেখে দি, বিমলকে পড়াবে।"

হেমলতা। এখন তা' হ'লেই হ'বে। পরে নয় কোলকাতায় পাঠান যাবে। দাদা নেই, বুড়ী পিসি-মা প্রাণ দিয়ে ছেলে দু'টোকে পাল্‌ছেন। এক জনের ভার আমরা নিলে পিসিমার অনেক আসান হ'বে।

বিজয়। উমেশবাবুর কথা বোধ হয় তোমার মনে আছে। তাঁর গুণেই কিন্তু এ রত্ন-হার আমার গলায় উঠেছে।

হেমলতা। আমি ত তাঁকে ঘটক ম'শায় ব'লে ডাকি।

বিজয়। তিনি আমাকে যে রত্ন দিয়েছেন—তার প্রতিদান জগতে নেই—তবুও তাঁকে কিছু পুরস্কার দিতে

তাঁর একটি ছেলে বি, এ পাশ ক'রেছে। শুন্‌ছি সে নাকি বিলেত যাবে। একটু বেশী মাইনে দিয়ে ছেলেটিকে এখানে রাখ্‌লে হয় না? বিলেত যাবার খরচ অনেক। উমেশবাবুর অবস্থাও তত সচ্ছল নয়, কি বল তুমি?

হেমলতা। উমেশবাবুর বড় ছেলে—নরেশবাবু নাকি লেখা পড়ায় খুবই ভাল হ'য়ে উঠেছেন। ছেলে বেলায় তাঁর হাতে কত যে প্রহার খেয়েছি তা'র ঠিক নেই। একটু লিখ্‌তে পড়্‌তে যা' কিছু শিখেছি—তা' সেই নরেশ বাবুর প্রহারের গুণেই।

বিজয়। আমি আজই লোক পাঠিয়ে নরেশকে এখানে আন্‌বার প্রস্তাব করি। বিমলের সঙ্গে তোমারও কিছু লাভ হ'বে।

হেমলতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ বয়সে এখন আবার নরেশবাবুর হাতে কাণ-মলা খাবার সাধ নেই।"

বিজয়বাবু বাহিরে গেলেন।

পরদিন বিমলের গৃহ-শিক্ষক নরেশবাবু আসিয়া বিজয়বাবুকে প্রণাম করিলেন।

আশীর্ব্বাদ করিয়া বিজয়বাবু বাড়ীর সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে বলিলেন, "এতখানি পথ হেঁটে আস্‌তে বোধ হয় খুবই তোমার কষ্ট হ'য়েছে। একটু বিশ্রাম কর। বাড়ীর ছেলের মতই এখানে থাক্‌বে—দ্বিধা বা সঙ্কোচের কোন কারণ নেই।"

বিমলকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন,—"এই তোমার ছাত্র নরেশ!"

নরেশ বিমলকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

বিজয়বাবু কহিলেন, "যা" ত বিমল নরেশের সঙ্গে, বাড়ীর ভিতর থেকে একটু কিছু মুখে দিয়ে আসুক।"

নরেশ আপত্তি করিয়া কহিলেন, "এখন থাক্ না। আপনার সঙ্গে একত্রেই খাব।"

বিজয়বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে একত্রে খাওয়া ত হ'বে না। তুমি যে বিলেত যাচ্ছ।"

নরেশ কহিলেন, "বিলেত না যেতেই যে আপনি আমাকে একঘরে ক'রলেন।"

বিজয়। বেশী হিন্দু যা'রা :তাঁদের ব্যবস্থা ত এ রকমই হ'য়ে থাকে। সংকল্পেই যে পাপ জন্মে।

নরেশ বিমলের সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে হেমলতা গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন।

নরেশ হেমলতাকে দেখিয়া একটু চমকিয়া উঠিলেন।

সেই বালিকা হেমলতাব দেহের উপর এমনি ধারা একটা আমূল পরিবর্ত্তন, দেখিবার পূর্ব্বে ত' নরেশের প্রাণে স্থান পায় নাই!

হেমলতা নরেশের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বাড়ীর সব ভাল আছেন ত? আস্‌বার সময় পিসিমার সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছেন কি?"

নরেশ। হ্যাঁ, বাড়ীর সকলেই ভাল আছেন। তোমার পিসি-মাকে ও বিমলের ছোট ভাইটিকে আসবার সময় দেখে এসেছি।

হেমলতা। পিসিমা কি কিছু ব'লে পাঠিয়েছেন ?

নরেশ। বিমলকে একটু যত্ন ক'রে লেখাপড়া শেখাতে ব'লে দিয়েছেন।

হেমলতা। আপনি ঘরের ভিতর আসুন। যে গরম— আন্‌তো পাখাখানা বিমল !

নরেশ গৃহের মধ্যে উপবেশন করিলেন। হেমলতা ধীরে ধীরে তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

হেমলতা বলিলেন, "দেখ বিমল, ইনি শুধু তোমারই মাষ্টার ন'ন। ছেলে বেলায় আমারও মাষ্টার ছিলেন।"

নরেশ। সে কথা এখনও কি তোমার মনে আছে ?

হেমলতা। পড়া না শিখ্‌লে যে সাজা দিতেন—সে কথাটা কি এত তাড়াতাড়ি ভোলবার যো আছে।

নরেশ। সে সাজার ভয় ত আর এখন নেই !

হেমলতা একটা দাসীকে ডাকিয়া নরেশবাবুর জলযোগের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

১০

অন্তঃপুর-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হেমলতা একরাশি ফুলে অঞ্চল ভরিয়া ফেলিয়াছেন।

বিজয়বাবু বাগানে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আজ যে দেখ্‌ছি ফুল-শয্যার আয়োজন! এত ফুল দিয়ে কি ক'রবে হেম?"

হেমলতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আজ তোমাকে সাজাব। বাগানে যত রকম ফুল আছে, আমি সব তুলেছি। তুমি একবার বোস দেখি।"

হেমলতা বিজয়বাবুর হাত ধরিয়া তাঁহাকে নবীন শষ্পাবৃত ভূমিতলেই বসাইয়া দিলেন। অঞ্চল হইতে ফুলগুলি খুলিয়া বলিলেন, "এখন তুমি যে'তে পাবে না। মালা গেঁথে, তোমাকে সাজিয়ে ঘরে নিয়ে যাব।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া হেমলতা মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন।

বিজয়বাবু ভাবিতে লাগিলেন—হেমলতার পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও ফুল-সাজে সজ্জিত হওয়াটা তাহার পক্ষে বড়ই বিসদৃশ।

ধার করা অর্থের উপর বড়াই করা যেমন নিষ্ফল, বিজয়বাবু বুঝিতেছিলেন জোর করিয়া ছেলেমানুষ হওয়ার চেষ্টাটা ও তেমনি তা'র পক্ষে নিষ্ফল হইয়া উঠিতেছে। বিজয়বাবু এখন মনে

করিতেছেন—এ নূতন বিলাস-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়াও ত তিনি প্রাণটাকে সকল রকমে স্থির করিয়া রাখিতে পারেন নাই। বিদায় কালীন অভিমান দীপ্ত অনিলের মুখখানি, কাতরতা মাখা রমার আনত দৃষ্টি ত তিনি ভুলিতে পারেন নাই। সে অবিচার জনিত আত্মগ্লানি ত তাঁহার হৃদয় ছাড়িয়া একেবারে দূরে যায় নাই।

অনিল ও রমার সঙ্গে আর একখানি মুখ তাঁহার প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। সে যেন অনিল ও রমার জন্য কাতর ভাবে করুণা ভিক্ষা করিতেছে। হেমলতার সৌন্দর্য্যরাশি ত একেবারে সে স্মৃতিকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই।

এ জন্যই বিজয়বাবু মধ্যে মধ্যে বড়ই উন্মনা হইয়া উঠিতেন।

যত্ন-রচিত-মাল্যে বিজয়বাবুকে সজ্জিত করিয়া হেমলতা কহিলেন, "খুবই তোমায় মানিয়েছে কিন্তু! চল না, একবার আরশীতে দেখ্‌বে!"

বিজয়। তা'র চেয়ে বরং এ সব মালা দিয়ে তোমাকে সাজিয়ে ঘরে নিয়ে যাই। মনে হ'বে ফুলের রাণী স্বর্গ থেকে ভূতলে নেমে এসেছেন।

হেমলতা। তা' হ'বে না। একগাছি মালাও আমি খুল্‌তে দেব না।

বিজয়বাবুর হাত ধরিয়া হেমলতা গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন।

বিজয়বাবু কহিলেন, "ঝি, চাকর যদি কেউ এসে পড়ে হেম, তবে ভারি লজ্জা পাব। মালাগুলি খুলে রেখে নয় বাড়ীর ভিতর যাই।"

"না গো, না। আমি আগে গিয়ে ঝি, চাকরদের বিদায় ক'রে দিচ্ছি। তুমি একটু দাঁড়াও," বলিয়া হেমলতা দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

একাকী দাঁড়াইয়া বিজয়বাবু একবার নিজের অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। অমনি হেমলতা আসিয়া কহিলেন, "এইবার এসো। দু'ঘণ্টার জন্য ঝি, চাকরদের ছুটি দিয়ে এসেছি।"

বিজয়বাবু নীরবে হেমলতার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—এ প্রহসনের পালা কবে শেষ হবে।

১১

কয়েক দিনের মধ্যেই বিজয়বাবু কেমন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন একটা উদাস ভাব আসিয়া পড়িল।

একদিন তিনি হেমলতাকে বলিলেন, "নরেশের কাছে একটু লেখাপড়া শিখ্‌লে হয় না হেম! বিমলের সঙ্গে বসে পড়্‌তে ত তোমার লজ্জার কারণ নেই। নরেশ ত তোমার ছেলেবেলার মাষ্টার।"

হেমলতা। ছেলেবেলার মাষ্টারের সঙ্গে ত এখন আর কোন সম্পর্ক নেই। এখন তুমিই আমার মাষ্টার—যা শিখ্‌তে হয়, তোমার কাছেই শিখ্‌বো।

বিজয়বাবুর প্রাণটা একটু অবসরের জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। তিনি কহিলেন, "সেরেস্তায় অনেক কাজ পড়ে আছে। আমি ছাড়া সে সব কাজ দেখ্‌বার ত অন্য লোক নেই।"

কথাগুলি বলিবার সময় অনিলের মূর্ত্তিখানি বিজয়বাবুর মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। একটা যেন অপরাধ জনিত লজ্জায় তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

বিজয়বাবুর এ আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া হেমলতা কহিলেন, "আমি কি কোন দোষ ক'রেছি?"

বিজয়। দোষ তোমার কিছুই নেই হেম! সংসারের সকল দিক বজায় রেখে ত চল্‌তে হ'বে। নরেশের কাছে যদি

তুমি পড়্‌তে স্বীকার হও, তবে আমি রোজই কিছু কিছু সেরেস্তার কাজ দেখ্‌তে সময় পাবো।

হেমলতা। আমি কি তোমাকে সারা দিনরাত আট্‌কে রাখি ?

বিজয়। তা' নয় হেম! তোমাকে অন্য কাজে নিযুক্ত দেখ্‌লে আমি তোমার কাছে বসে থাক্‌বার সুযোগ পাব না—তা'তে তোমারও উপকার হবে।

হেমলতা অভিমানের সুরে কহিলেন, "তুমি কাছে না থাক্‌লে, সংসারে এমন কিছু নেই যা'তে আমার উপকার হ'তে পারে। তুমি সেরেস্তার কাজ দেখ। আমি সে সময়টা বই পড়ে, না হয় হারমোনিয়ম বাজিয়ে কাটিয়ে দেবো।

বিজয়। মফঃস্বলে একটা মহাল বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে। সেখানেও একবার যাওয়া দরকার।

হেমলতা শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বিদ্রোহী মহালে গিয়ে তোমার কাজ নেই। নায়েব গোমস্তা কাউকে সেখানে পাঠিয়ে দেও।"

বিজয়। সম্পত্তি যে আমার হেম! মহালের লোক সব যে আমারই প্রজা। নায়েবের প্রাণের মধ্যে ত আমার প্রাণটা মিশিয়ে সেখানে পাঠাতে পারবো না।

হেমলতা। জোর করে যাবে যাও। ধরে রাখ্‌বার শক্তি তো আমার নেই।

বিজয়বাবু কথাটা চাপা দিয়া বলিলেন, "বড় ক্ষিধে পেয়েছে হেম! কিছু খেতে দেবে চল।"

১২

নরেশ হেমলতার কথা ভাবিতেছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অপরিপক্ক হস্তে অঙ্কিত ছবিখানি আজ নূতন শিল্পীর তুলিকা স্পর্শে কি মধুর সৌন্দর্য্যে প্রাণময়! সেই ছবির এ মনোরম পরিণতি হৃদয়কে আকৃষ্ট না করিয়া ত পারে না। বালিকা বোধে পূর্ব্বে যাহাকে যথেচ্ছ শাসন করিয়াছেন, আজ সেই বালিকা-মূর্ত্তির মধ্যে এ বিশাল সৌন্দর্য্যের বিকাশ যেন নরেশকে একটু চঞ্চল করিয়া তুলিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—সেই ক্ষুদ্র লতিকাটি পুষ্পাভরণে কতই না মহিমান্বিতা—প্রতিপদের ক্ষীণ চন্দ্র-রেখার আজ পূর্ণিমার তিথিতে কতই না ঐশ্বর্য্য—বৃক্ষপত্রে লুক্কায়িত ক্ষুদ্র কলিটি আজ কি স্বর্গীয় সুষমায় প্রস্ফুটিত।

নরেশ যতই ভাবিতে লাগিলেন, হেমলতার শোভা-সৌন্দর্য্য যেন ততই তাঁহার প্রাণে উজ্জ্বলতর হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

একটি ভৃত্য আসিয়া বলিল, "আপনার জলখাবার দেওয়া হ'য়েছে মাষ্টার বাবু!"

নরেশ উত্তর করিলেন, "আচ্ছা।"

যে চিন্তা নরেশের প্রাণ অধিকার করিয়া আছে, তাহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। নরেশ ভাবিতে লাগিলেন—একটু চেষ্টা

করিলেই এ ফুল-হার তিনি নিজের গলায় পরিতে পারিতেন। সে প্রস্তাব একবার না হইয়াছিল এমন নয়—কিন্তু বর্ত্তমানের এ অবস্থা ত নরেশ তখন কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। তীব্র অনুশোচনায় তাঁহার প্রাণটা ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। বিমল আসিয়া বলিল, "ঘণ্টাখানেক আপনার জলখাবার নিয়ে পিসিমা বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা ক'রেছেন, জলখাবার কি বাইরে পাঠিয়ে দেবেন?"

সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নরেশ বলিলেন, "চল, যাচ্ছি।"

নরেশ ভিতরে আসিতেই হেমলতা বলিলেন, "আমার এক ঘণ্টা সময়ের দাম আপনাকে দিতে হ'বে। আপনার কাছেই পড়েছি, সময়ের মূল্য নেই—তবে দাম শোধ ক'র্‌বেন কি করে?"

নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শোধ কর্‌তে না পারি—না হয় দেনাই থাক্‌বো।"

হেমলতা কহিলেন, "খানকত ভাল গল্পের বইয়ের নাম করুন না, আমি কিনে পড়বো।"

নরেশ। তুমি কি কি বই পড়েছ তা' ত জানি না। সে গুলো বাদ দিয়ে ত বল্‌তে হ'বে।

হেমলতা। আমি আর ক'খানাই বা পড়েছি। এই আজ বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখর শেষ হ'ল।

নরেশ। পড়ে সব বুঝেছ?

হেমলতা। আমার মত আমি বুঝেছি—তবে তা' ঠিক কি না জানিনা।

নরেশ। কি বুঝেছ বল ত ?

হেমলতা হাসিয়া বলিলেন, "ঠাট্টা ক'র্‌বেন না ত ?"

নরেশ। বল না, ঠাট্টা করবো কেন ?

হেমলতা। যদি না ঠিক হয় ?

নরেশ। আমি বুঝিয়ে বল্‌বো।

হেমলতা। প্রথমে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে বিবাহ ক'রে একটা মস্ত ভুল করেছিলেন। শৈবলিনীটা খুবই খারাপ, কিন্তু তা'র উপর দয়া হয়। প্রতাপ খুব শক্ত লোক—সব চেয়ে ভাল হ'চ্ছে দলনী বেগম।

নরেশ। এত বড় বই খানার দু'কথায় সমালোচনা ত নেহাৎ মন্দ নয়।

বিজয়বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "পুরাতন ছাত্রীকে কিছু শেখাচ্ছ নাকি নরেশ ?"

হেমলতা একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। বিজয়বাবু বলিতে লাগিলেন, "কাল সকালেই আমি মফঃস্বলে যাচ্ছি। বিমলকে যেমন দেখ্‌বে—বাড়ীর সকলের উপরেও তেম্‌নি দৃষ্টি রেখো।"

নরেশ একবার বিজয়বাবুর প্রতি ও পরে হেমলতার দিকে চাহিলেন। তাঁহার কেবলি মনে হইতে লাগিল—বিশ্বাস ঘাতকতা যেন প্রাণে স্থান না পায়।

জলযোগ সমাপনান্তে নরেশ বাহিরে গেলেন।

বিজয়বাবু কহিলেন, "দূরে যেতে প্রাণটা যেন ব্যথিয়ে উঠ্‌ছে হেম! কিন্তু তবুও যেতে হ'বে।"

হেমলতা বিজয়বাবুর মুখের প্রতি স্থির নেত্রে চাহিলেন।

হেমলতার অশ্রুসিক্ত নয়ন মার্জ্জনা করিয়া বিজয়বাবু কহিলেন, "যত শীঘ্র পারি ফিরে আস্‌তে চেষ্টা কর্‌বো।"

১৩

জমীদারী পরিদর্শন করিতে বিজয়বাবু মফঃস্বলে বাহির হইয়াছেন।

বিজয়বাবুর প্রতি হেমলতার বড়ই রাগ হইল। তাঁহার হৃদয়ের নিদ্রিত প্রবৃত্তি গুলিকে এমনি ভাবে জাগাইয়া বিজয়বাবু কেন এখন সরিয়া দাঁড়াইলেন?

এ অন্তহীন অতৃপ্তি বুকে লইয়া হেমলতা যে আর থাকিতে পারেন না। এ অভাব ত পূর্ব্বে তিনি এক দিনও অনুভব করেন নাই।

দারিদ্র্যের মধ্যে যে প্রতিপালিত হয়, অনাদর উপেক্ষার মধ্যেই যে গঠিত হইয়া ওঠে—অভাবের তাড়নায় তাহার প্রাণে ত আঘাত লাগে না—সে যে তাহার স্বভাব।

জিনিষটা না চিনিয়া, না পাইয়া—জিনিষের স্বাদ না জানিয়া কেহ ত কখনও সে জিনিষের জন্য অধীর হয় না।

হেমলতা যাহা জানিতেন না, বিজয়বাবু তাঁহাকে তাহা জানাইয়াছেন, যাহা বুঝিতেন না, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার দরিদ্র হৃদয়কে ধনবানের প্রমোদ-ভবনের ন্যায় সাজাইয়া তুলিয়াছেন। এখন আবার এ কি ছলনা!

হেমলতা এ চিন্তার কূল পাইতেছিলেন না।

এমন সময় বিমল আসিয়া বলিল,—"চমৎকার পিসিমা!

মাষ্টার মশায় যে এমন গাইতে পারেন তা' একদিন ও ভাবিনি। যদি একবার শোন, বুঝ্‌বে কি সে গান!" .

হেম। খুবই নাকি ভাল রে?

বিমল। কেমন ক'রে তোমাকে শোনাই বল ত? পড়্‌বার ঘরটা বদ্‌লে ফেল্লে হয় না? এমন একটা ঘর বেছে নি; যেখান থেকে গাইলে তোমাকে বাইরে গিয়ে শুন্‌তে হ'বে না।

হেম। তা' যা' হয় কর্‌। দেখিস্‌ যেন বাড়ীর ভিতর এনে না ফেলিস্‌!

বিমল। না না,—তা' কেন? উপরে বাবুর বৈঠক খানার পাশে যে ছোট ঘরটা আছে—সেইটেই ঠিক হ'বে। এ ঘরের একটা জানালা খুলে রাখ্‌লেই তুমি শুন্‌তে পাবে। যে গানটা গাওয়া হ'বে আমি আগেই তোমায় লিখে দিয়ে যাবো। ইচ্ছে কর্‌লে তুমি সে গানটা হারমোনিয়ম বাজিয়ে শিখে নিতেও পার্‌বে। এ দু'দিন আমার কিছুই শেখা হ'চ্ছে না। মাষ্টারমশায় গাইলে কেবল শুন্‌তেই ইচ্ছে করে, শেখ্‌বার কথা মনে থাকে না।

হেম। তাই নাকি রে? এমন ওস্তাদ তোর মাষ্টার!

বমল। যখন শুন্‌বে—তখন টের পাবে। আমি যাই, এখনি ঘরটা ঠিক ক'রে ফেলি গে।

বিমল ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিল। হেমলতা ভাবিতে লাগিলেন,—একটা কিছু না ক'রে ও ত প্রাণটা স্থির থাক্‌ছে না। এই বা নেহাৎ মন্দ কি? দীর্ঘ অবসরটা এক রকমে কেটে যাবে।

তাঁহার মনে হইতে লাগিল—মাষ্টার, ছেলে বেলা তাঁর কাছে

খান কত বই পড়েছি—সে দিন ত এখন নেই—আর কি-ই বা তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ—দূর ছাই, যাক্ গে—

হেমলতা হারমোনিয়ম লইয়া গাহিতে বসিলেন। গলা আর যন্ত্রটা যেন বিবাদ বাঁধাইয়া বসিল। কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নাই।

বিরক্ত হইয়া হেমলতা হারমোনিয়মটা আছড়াইয়া ফেলিলেন। একখানা নভেল লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক পাতা পড়িয়া ও কিছু অর্থ বোধ করিতে পারিলেন না। দীর্ঘ দর্পণের নিকট দাঁড়াইয়া সুবেশে সাজিলেন, অঙ্গে পুষ্পসার ছড়াইয়া গৃহ-খানিকেও সৌরভে আমোদিত করিয়া তুলিলেন। পরিপূর্ণ দেহের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাবিলেন, রূপগর্ব্ব ত আর নেই আমার। কিসের জন্যই বা এই রূপ, আর কা'র জন্যই বা এ সাজ সজ্জা!

হেমলতা বিরক্তভাবে দেহ-সজ্জা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সুগন্ধি শিশিটা পদতলে লুটাইতে লাগিল।

হৃদয়ে উদাস ভাব—নয়নে উদাস দৃষ্টি—হেমলতা একখানি কেদারার উপর বসিয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিল। স্বপ্নরাজ্যের সঙ্গীতের ন্যায় একটা মধুর স্বর হেমলতার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে যেন এ দারুণ চিন্তাস্রোত হইতে তুলিয়া ধরিল। হেমলতা আসন হইতে উঠিলেন না। সঙ্গীতের স্বর-লহরী তাঁহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা তুফানের সৃষ্টি করিয়া দিল।

এমন গান ত হেমলতা কখনও শোনেন নাই। কত আশা নিরাশার কথা বুকে জাগাইয়া—কত বিরহ-মিলনের ছবি অঙ্কিত করিয়া সে মধুর স্বর যেন হেমলতার গৃহময়, প্রাণময় বিচরণ করিতে লাগিল।

হেমলতা মনে মনে কহিলেন, "এ কি তৃপ্তি? না—এ যে অনলে ঘৃতাহুতি। তিনি গৃহের উন্মুক্ত বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিলেন। অবশ ভাবে উপাধানে মুখ লুকাইয়া নয়ন সিক্ত করিয়া ফেলিলেন। কিসের এ ক্রন্দন?

১৪

রোজই এমন হইতে লাগিল। ব্যাধের সঙ্গীতে মুগ্ধা হরিণী যেমন বিপদ ভুলিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ করিয়া কাণ পাতিয়া দেয়—হেমলতা ও তেমনি করিতে লাগিলেন।

এ সঙ্গীত শ্রবণে হেমলতার সমস্ত প্রাণটা আলোড়িত হইয়া ওঠে। এক একবার হেমলতা ভাবেন—কাজ নেই আর এ গান শুনিয়া, কিন্তু গানের সুর কর্ণে প্রবেশ করিলেই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া পড়েন।

বিমল আসিয়া বলিল, "পিসিমা, কাল তোমাকে যে গানটা শিখে দিয়েছিলাম, আজ সেইটেই গাওয়া হ'বে। জান ত এ সব গান মাষ্টার ম'শায়ের নিজের। যত গান শোন সব তাঁর নিজের লেখা।

হেমলতা। তোর মাষ্টার কবি ও নাকি রে? আমি কিন্তু যখনি তাঁকে দেখি—মনে হয় যেন তিনি উদাস নয়নে চেয়ে কি ভাব্‌চেন! আমি তাঁর গান শুনি, এ কথা তাঁকে বলেছিস নাকি?

বিমল। আমি বলিনি, কিন্তু তিনি টের পেয়েছেন।

হেম। কি লজ্জা! টের পেয়ে কি বল্লেন রে?

বিমল। তোমার খুব প্রশংসা কর্‌লেন। হিন্দু গৃহে এমন শিক্ষিতা রমণীর সংখ্যা যে দিন খুব বেশী হ'বে, সেই দিনই নাকি

ভারতবর্ষের কলঙ্ক ঘুচ্‌বে। মাষ্টার ম'শায়ের কবিতার খাতায় এমন কত কি লেখা আছে। দেখতে চাও যদি, এখনি নিয়ে আস্‌তে পারি।

হেম। এখন থাক্—আনিস্ একদিন—আচ্ছা—না—যা' তবে নিয়ে আয়; একবার দেখেই ফিরিয়ে দেব।

বিমল চলিয়া গেল। হেমলতা দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত গোলমাল হইয়া পড়িতেছে। দীর্ঘ সাত বৎসরের যবনিকা তুলিয়া এ মূর্ত্তি কেন আবার তাঁহার নয়নের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল? ভুলিয়া যাওয়া খুবই প্রয়োজন মনে করিয়া যাঁহাকে এতদিন ভুলিয়াছিলেন, আজ আবার সেই নামে, তাঁহার গানে প্রাণের মধ্যে এ কুহকের সৃষ্টি হয় কেন? এ চিন্তা রোধ করিবার কি উপায় নাই? হেমলতা আর ভাবিতে পারিলেন না। নীরবে বাতায়ন সমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নয়নের সম্মুখে দেখিলেন, সেই ঐন্দ্রজালিক মাষ্টার নরেশ। হেমলতা বিপরীত দিকে ফিরিলেন।

হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া বিমল বলিল, "এই যে এনেছি পিসিমা! প্রথমে ত দিবেনই না—অনেক ব'লে ক'য়ে, তোমার নাম ক'রে নিয়ে এলাম।"

হেমলতা বলিলেন, "তবে আন্‌লি কেন? যে না দিতে চায়—তাঁ'র জিনিষ নিতে গেলি কেন?"

বিমল বলিল, "বাঃ! তুমি যে দেখ্‌বে বল্লে!"

বিমল টেবিলের উপর খাতাখানা রাখিয়া বলিল, "তুমি ততক্ষণ পড়, আমি একটু বাদে আস্‌ছি।"

বিমল চলিয়া গেলে হেমলতা খাতাখানি তুলিয়া লইলেন। খাতার মধ্যে অনেক কবিতা। একটা বেদনামাখা আকুল আহ্বানই যেন সমস্ত কবিতাগুলির প্রাণ। এমনি সুন্দর ভাষায়, এমনি সুন্দর ভাবে কবিতাগুলি রচিত, যে পড়িতে পড়িতে হেমলতার প্রাণখানি ও সে আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠিল। একটা যেন কেমন ভাবময় আবেশে হেমলতা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

হঠাৎ হেমলতা খাতাখানি ছুড়িয়া ফেলিলেন। সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে কাগজ কলম লইয়া বিজয়বাবুকে পত্র লিখিলেন।—

প্রিয়তম,—

এখানে থাক্‌তে আমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে। হয় তুমি এসো, না হয় আমাকে এখান থেকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। এ চিঠির উত্তর আমি চাই না। তোমাকেই কাছে পে'তে চাই।

তোমারই—হেম।

ঠিকানা লিখিয়া তখনই পত্রখানা ডাকে রওনা করিয়া দিলেন।

১৫

আনন্দময়ী যোগেশবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ সব কি শুনছি যোগেশ? হীরালাল নাকি বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে থিয়েটার খুলেছে?"

যোগেশ। তোমাকে এ খবর কে শোনালে মা? ও সব তুমি বুঝ্‌বে না। তোমার মালা নিয়ে ঠাকুর ঘরে বসে থাক্‌বার ব্যাঘাত ত কেউ জন্মায় নি?

আনন্দময়ী। তুই ত কোন খোঁজই রাখিস্ না। এ বাড়ীতে এসে পাড়ার লোক যে আর কেউ পাত্ পাত্‌বে না। গ্রামের সকল লোকই বলে বেড়াচ্ছে তোরা মেলেচ্ছো হ'য়ে গেছিস্।

যোগেশ। কই, আমি ত এ সব কিছু শুনিনি।

আনন্দময়ী। এই সৌরভি ঝিকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, পাড়ায় এ সব কথা নিয়ে কত কাণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে।

সৌরভি অগ্রসর হইয়া বলিল, "হ্যাগো, বড় বাবু, আমি গাঁয়ে শুনে এলুম, কেউ আর আপনাদের বাড়ী এসে খাবে না। মামাবাবু খিষ্টান হ'য়ে যখন তোমাদের বাড়ীতে ঠাঁই পেয়েছে তখন ত আপনাদেরও জাত গিয়েছে। জাত খোয়াতে কে আর তোমাদের বাড়ী আস্‌বে বল?"

ক্রমেই যোগেশবাবুর মেজাজটা একটু গরম হইয়া উঠিতেছিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কথা কা'রা বল্‌ছিল রে সৌরভি ?"

সৌরভি। গাঁয়ের সকলেই ত ও কথা বল্‌তেছিল। আচায্যি ঠাকুরের ছেলে, কাশী বুড়ো, রামধন পণ্ডিত, সেই সোন্দর পানা চক্কোবত্তি—আর কত লোক সেখানে ছেল !

যোগেশ। গ্রামের লোকগুলো বড়ই বাড়িয়ে তুলেছে—আচ্ছা দেখি !

আনন্দময়ী। হঠাৎ কিছু করে ফেলিস্‌নে যোগেশ, ভাল কথায় হীরালালকে বাড়ী পাঠিয়ে দে, সব মিটে যাক্।

যোগেশ। তা' হয় না মা ! এমন ক'রে গ্রামের লোকের কাছে মাথা নীচু কর্‌তে পার্‌বো না। আমার মাটিতে বাস ক'রে আমারই জাত মার্‌তে চাইছে যা'রা, তা'দের আমি একবার ভাল করেই দেখে নেবো।

আনন্দময়ী। কথা শোন্ যোগেশ ! আমি জগদীশ আচার্য্যকে ডেকে সব কথা শুনি, তা'র পর তুই যা' ইচ্ছে করিস্।

যোগেশ। আচার্য্যের ছেলেই যখন এ দলে আছে তখন আর তাঁ'কে ডেকে কি হ'বে মা ? ডাক্‌তে হয় তো, প্রজাকে মনিব যেমন ক'রে ডাকে, তেমনি ক'রেই ডাক্‌বো।

পার্শ্বের ঘর হইতে বাহির হইয়া অনিল বলিল, "আচার্য্য ঠাকুরের নাম অমন তুচ্ছ ক'রে উচ্চারণ করবেন না মামাবাবু ! তিনি যে দেবতা। আর তাঁ'র ছেলে শচীনের তুলনা নেই। এত দিনেও কি আপনি তাঁ'দের পরিচয় পান্‌নি ?"

উগ্রভাবে যোগেশবাবু কহিলেন, "ছেলের মুখে অমন বুড়োর মতন কথা ভাল শোনায় না অনিল! যে বিষয় বোঝ্বার তোমার ক্ষমতা নেই, তা'র সমালোচনা না করাই ভাল।"

অনিল। এ বিষয়টা এত সোজা যে বুঝ্তে মোটেই কষ্ট হয় না। মিঃ হীরালাল এ বাড়ীতে এসেছেন ব'লে আমি কোন কথা বল্ছি না, তবে তাঁ'র থিয়েটারের দলটা বড়ই নিন্দের জিনিষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সে দিন রমাকে মিছি মিছি অপমান করা হ'য়েছে। মনে করেছিলাম আপনাকে সে কথা জানাবো না, কিন্তু আপনি যখন এ কাজে উৎসাহ দিচ্ছেন তখন আর চুপ করে থাকা ত চলে না। আজও রমার চোখের জল শুকোয় নি?

যোগেশবাবু। রমাকে অভিনয়ে যোগ দিবার জন্য ডাকা হয়েছিল, এইত—না? তা' না হ'য় তোমরা ভাই বোনে সে দিক্ মাড়িওনা। তবেই ত কোন কথা থাক্বে না।

অনিল। আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করার শক্তিও আমার নেই। তবে এ অভিনয়ের দলটা ভেঙ্গে দেওয়া যে খুবই উচিত, তা জোর ক'রে বল্তে পারি।

"আর পণ্ডিতিতে কাজ নেই। দেখ্ছি একেবারে অকালে পেকে উঠ্ছো" বলিয়া যোগেশবাবু ক্রোধভরে প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধা প্রমাদ গণিলেন। যোগেশবাবুর ক্রোধে গ্রামের মধ্যে যে একটা দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হ'বে, সে কথা তিনি বেশ বুঝিলেন। কিন্তু গ্রামবাসী লোকগুলিকে এ অত্যাচারের

হাত হইতে ত্রাণ করিবার উপায় ত কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। বৃদ্ধা অনন্তোপায় হইয়া ভগবানকে স্মরণ করিলেন।

এমন সময় সরযূর সহিত রমা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। রমাকে দেখিয়া আনন্দময়ী বলিলেন, "মুখখানা অমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন দিদি ?"

সরযূ। বড় বউদি ওর প্রাণে বড়ই আঘাত করেছেন। মুখ ফুটে ও আমায় কিছু বলেনি—কিন্তু আমি সব শুনেছি।

আনন্দময়ী। তাই নাকি ? বড় বউয়ের কাছে তুই কি অন্যায় করেছিস্ রমা ?

সরযূ। অন্যায় যে কেমন ক'রে কর্‌তে হয়, তা' তো রমা জানে না। রমাকে থিয়েটার কর্‌তে বলা হ'য়েছিল, রমা তা'তে রাজী হয়নি।

আনন্দময়ী। একটু আগে অনিল সে কথা যোগেশকে জানিয়েছে—এ'তে অনিলের রাগ ত হ'তেই পারে।

রমা। আমি ত সে কথা ভুলে গেছি। মামিমার কথায় প্রাণে যে দাগ পড়েছিল, বরেন দাদার স্নেহে যে সে দাগটা ধুয়ে ফেলেছি দিদিমা !

অনিল। আমি কিন্তু শত চেষ্টায়ও সে কথা ভুল্‌তে পাচ্ছি না।

সরযূ। বরেনের হৃদয়খানি বড় স্নেহমাখা, বড়ই সুন্দর। দেখ্‌লে মনে হয় যেন একখানি উল্লাসময় ছবি কাছে এসে দাঁড়ালো।

আনন্দময়ী। বড়ই একটা অমঙ্গলের ছায়া নিয়ে হীরালাল এ বাড়ীতে এসেছে। যোগেশ ত কিছু বল্‌বে না, অভিমানেই সে পাগল। আর বড় বউ ত এ সবই চায়। কি যে কর্‌বেন ভগবান, তা তিনিই জানেন। গ্রামের মধ্যে একটা কুরুক্ষেত্র না বেঁধে যায়।

বৃদ্ধা মালা জপিতে বসিলেন, এমনি সময় বরেনের সহিত বিন্দুরাণী আসিয়া অনিল ও রমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

বরেন কহিল, "এই দেখ মা! আহত প্রাণে রমা কেমন নির্জীব ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।"

রমার মুখখানি ধরিয়া বিন্দুরাণী কহিলেন, "সে দিন বড়ই তোকে খারাপ কথা বলেছি রমা! সে কষ্ট তুই ভুল্‌তে পারিস্‌নি দেখ্‌ছি। আমার খুবই তখন রাগ হ'য়েছিল—সে সব কথা ভুলে যা রমা!"

রমা। আমি ত সে সব কথা মনে ক'রে কোন দুঃখ কর্‌ছি না।

বিন্দুরাণী অনিলের হাত ধরিয়া কাছে আনিলেন। বলিলেন, "দুটি ভাই বোনে প্রতিজ্ঞা কর, আমি সে দিন যা' সব বলেছি একেবারে ভুলে যাবি।"

অনিল। এক কথা অত ক'রে বল্‌বার ত দরকার নেই মামিমা! তুমি যখন বরেনদাদার মা—আমরাও তোমার সন্তান।

বিন্দুরাণী। খুবই খুসী হ'লেম অনিল। তোরা সুখে থাক্।

বিন্দুরাণী বরেনের সহিত চলিয়া গেলেন। অনিল কহিল, "এ সব বরেন দাদার কাজ। বেশ দু'কথা শোনাবার পর বোধ হয় মামিমার জ্ঞান হ'য়েছে।"

রমাকে ডাকিয়া অনিল বাহিরে গেল। বলিল, "আর এখানে বেশী দিন থাকা চল্‌ছে না, রমা!"

রমা। কোথায় যাবে দাদা?

অনিল। যা'বার জায়গা কি আমাদের একেবারেই নেই? তাই যদি হয়, তবে যেখানকার অপমানের আঘাতটা এখানকার অপমানের মত তীব্র ব'লে বোধ হ'বে না, সেইখানেই ফিরে যাব।

১৬

বাচস্পতির চণ্ডীমণ্ডপে আজ গ্রামের মাথাগুলি যেন একত্র হইয়া আসিয়াছে। যোগেশবাবুর অনুষ্ঠিত কার্য্যে সকলেই বিরক্ত।

বাচস্পতি কহিলেন, "আর কিছুই রইল না! ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে এখন পিতৃপিতামহের ধর্ম্মটাও যায় যায় হ'য়ে উঠ্‌লো। মনে হয়, গ্রাম ছেড়ে কাশী কি বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করি।"

রামধন পণ্ডিত কহিলেন, "সেখানে গেলে এত সাধের দল বাঁধা বাঁধির পালাটা একেবারে ফেঁসে যাবে যে বাচস্পতি দাদা! আমরা কি তোমার মত পেরে উঠ্‌বো!

বাচস্পতি ক্রোধমিশ্রিত স্বরে কহিলেন, "ঠাট্টার এ সময় নয় রামধন—আচার্য্যকে এখানে আস্‌তে বলা হ'য়েছিল। সে আস্‌বে কি না, একবার দেখে এলে হ'তো। এখানে পড়ে পড়ে এ অধর্ম্ম অনাচার সহ্য করা যে দায় হ'য়ে উঠ্‌লো।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "দেশের জমীদার যখন অধর্ম্মের পথে পা' দিয়েছেন, তখন আর এ দেশের মঙ্গল নেই। বিশেষ কুটুম্বের মান রাখ্‌তে গিয়ে তিনি সমাজ বা ব্রাহ্মণ কিছুই মান্‌তে রাজী ন'ন। শুন্‌ছি নাকি জোর ক'রে আমাদের নিয়ে তা'র বাড়ীতে খাওয়াবেন।"

দূরে শচীনকে আসিতে দেখিয়া রামধন পণ্ডিত কহিলেন,

"এই শচীন আস্‌ছে। আচার্য্য ভবে এলেন না—তা' শচীনের আসা আর আচার্য্যের আসা একই কথা।"

মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া শচীন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

বাচস্পতি কহিলেন, "একটা কিছু না করে' ত আর চুপ ক'রে থাকা চলে না। যোগেশবাবু বড়ই বাড়িয়ে তুলেছেন। আমাদের নাকি জোর ক'রে ধরে নেওয়াবেন।"

ধীর ভাবে শচীন কহিল, "কি অপরাধ আমাদের?"

বাচস্পতি। আমাদের অপরাধ ত কিছুই দেখ্‌তে পাই না। যোগেশবাবুর শ্যালকের সহিত পংক্তি ভোজনে আমরা রাজী নই।

শচীন হাসিতে হাসিতে কহিল, "মিঃ হীরালাল বোধ হয় আমাদের সঙ্গে কুশাসনে বসে কলার পাতায় ডাল ভাত খাবার কষ্ট স্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত নহেন—তবে আর আমরা এ আপত্তি করি কেন?"

বাচস্পতি। আরে পংক্তি ভোজন অর্থ কি কেবল একত্র বসে খাওয়া? তা' নয়—আমরা তা'র সংস্রব ত্যাগ কর্‌তে চাই।

রামধন। অর্থাৎ তা'র গায়ের বাতাসও আমাদের গায়ে না লাগে।

বাচস্পতি। বিলেতে গিয়ে নিজের জাতটি নিজে খুঁইয়ে এসেছেন—এখন আবার পাঁচ জনের জাত নিয়ে টানাটানি কেন বাপু?

শচীন। বিলেত গেলেই কি জাত যায় বাচস্পতি কাকা?

বাচস্পতি। যায় না আবার! ম্লেচ্ছ হ'য়ে গেলে কি আর তা'র জাত থাকে?

শচীন। আমার ধারণা কিন্তু তা' নয়। জাতিটা ব্যক্তিগত বলেই আমি মনে করি। যে গুণগুলি আছে বলে যে যা' তাই বলে পরিচিত হচ্ছে—সে গুণগুলির সমষ্টিই তা'র জাতি আর তাহাই তা'র ধর্ম্ম। যা'র জাতি যায়, তা'র ধর্ম্মও যায়।

রামধন। তবে একটা জাতি বা ধর্ম্ম গেলেও ত মানুষ উন্নত হ'তে পারে।

শচীন। তা' পারে বই কি! গুণগুলির পূর্ণ বিকাশেই জীব উন্নত হয়। সে বিকাশে মানব নূতন জাতিতে পরিবর্ত্তিত হয়, নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তবে তা'র পূর্ব্ব জাতি বা ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ভাবে রূপান্তরিত হয় মাত্র।

বাচস্পতি। পাগলের মত কি বল্‌ছো হে শচীন! জাতিই যদি গেল—ধর্ম্মই যদি না রইল, তবে আবার মানুষ উন্নত হয় কেমন ক'রে?

শচীন। প্রতিপদের চাঁদ পূর্ণিমায় কি বেশী উজ্জ্বল হয় না?

রামধন। গুটি পোকার প্রজাপতি হওয়ার মতন আর কি?

বাচস্পতি। কি যে সব হেঁয়ালী জুড়ে দিলে, তা' তোমরাই জান। ও সব ইংরাজী শিক্ষার কুফল। শাস্ত্র যা'কে ধর্ম্ম বলেছে—তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম গেলে আর কি পাওয়া যায়?

শচীন। এ সব যে আমি বাবার কাছে শিখেছি। তিনি ত ইংরাজী জানেন না।

রামধন। তোমার বাবার শাস্ত্র আর আমাদের শাস্ত্র যে এক জিনিষ নয় হে বাবাজি!

শচীন। সে কি কথা বল্‌ছেন?

রামধন। বল্‌ছি ঠিকই। আমাদের শাস্ত্র ধনীর বাড়ীতে বিদায় লাভের সাহায্য ক'রে। কেউ কোন অপরাধ কর্‌লে সেই শাস্ত্র সুবিধা মত সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ক'রে—আর বুঝি না বুঝি যদি কেউ আমাদের জ্ঞানের গণ্ডী ছাড়িয়ে কোন কথা কয় বা কাজ করে, তবে আমাদের সে শাস্ত্র তা'কে সমাজচ্যুত ক'রে।

বাচস্পতি। এখন তোমাদের পণ্ডিতিটা একটু থামাও। আসল কথাটা ত জানই শচীন। যোগেশবাবু ম্লেচ্ছ-সংশ্রব কচ্ছেন—আর আমাদের নাকি জোর ক'রে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে খাওয়াবেন।

শচীন। আমি শুনেছি সকল প্রার্থীকেই তিনি অন্ন দান করেন না। তবে আবার জোর ক'রে খাওয়ান কেন?

বাচস্পতি। ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত—শ্যালককে সমাজে চল করা।

শচীন। মিঃ হীরালালের সঙ্গে একত্র খেলে আমাদের অধর্ম্ম হ'বে কি না সে বিষয়ের বিবেচনার পূর্ব্বে যোগেশবাবুর এই জোর ক'রে খাওয়ান ব্যাপারটাই বেশী ভাব্‌তে হ'বে। তাঁর এ যথেচ্ছ ব্যবহার সহ্য কর্‌তে আমরা প্রস্তুত নই।

বাচস্পতি। ঠিক বাপের বেটার মত কথাটাই বলেছ

বাবাজি! কাল যোগেশবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। গিন্নিমার ব্রত-প্রতিষ্ঠা। সে নিমন্ত্রণ কিছুতেই গ্রহণ করা হ'বে না।

শচীন। ঠাকুরমার প্রাণে এতে খুবই আঘাত লাগ্‌বে। কিন্তু যোগেশবাবু যখন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ যে তিনি জোর ক'রে সকলকে খাওয়াতে পার্‌বেন, তখন আমাদের পক্ষে একটু দৃঢ়তার পরিচয় দেওয়া খুবই প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে।

রামধন। আমি ত ঠিক তাই ভাব্‌ছি। যোগেশবাবু যতদিন না "জোর" কথাটা ছাড়্‌বেন, ততদিন তাঁর শ্যালক সম্বন্ধে আমাদের কোন কথাই বিবেচনা কর্‌বার দরকার নেই।

বাচস্পতি। তবে এখন সব এসো। যে নিমন্ত্রণ কর্‌তে আস্‌বে, তা'র কাছেই যেন নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

রামধন। পরিণামটা কি একবার ভেবেছ বাচস্পতি দাদা?

শচীন। ন্যায় পথ অবলম্বন কর্‌লে পরিণাম বিষময় হয় না। এখন তবে আসি।

সকলেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৭

একটা প্রবল উত্তেজনায় যোগেশবাবুর মস্তিষ্কটা যেন একেবারে বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে। গ্রামের কয়েকজন ভদ্র লোককে তিনি ডাকাইয়া আনিয়াছেন। কোন ক্ষমতা নেই এমন যে এই ক্ষুদ্র লোকগুলি, তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করিতে সাহস করিয়াছে, এ চিন্তাটাও তাঁহার প্রাণে অসহ্য হইয়া উঠিল।

শচীনের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ্‌ছি এখন থেকে তোমাদের শাসন মেনে আমাকে চল্‌তে হ'বে।"

যোগেশবাবুর নয়নে বদনে যেন একটা উচ্ছ্বসিত ক্রোধের জ্বালা উপস্থিত লোকগুলিকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

শান্তভাবে শচীন বলিল, "আপনার এ উত্তেজিত অবস্থায় এ প্রসঙ্গটা এখন না তোলাই যুক্তি-সঙ্গত বলে বোধ হচ্ছে। আমরা না হয় অন্য এক সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বো।"

যোগেশ। তুমি একটু বেশী বাড়িয়ে তুলেছো। ও সব চালাকি আমি বুঝি। আমার এলাকায় বাস কর্‌তে হ'লে আমার মতের উপর মত রাখ্‌তে পার্‌বে না।

শচীন। আপনার মত নিয়ে আপনি থাকুন, কেউ ত তা'তে কোন আপত্তি করে না।

যোগেশ। তোমাদেরও সে মতে চল্‌তে হ'বে। আমি স্পষ্ট কথা শুন্‌তে চাই। বল, চল্‌বে কি না?

শচীন। ভয়ে বাইরে না হয় আপনার কাছে আত্ম বিক্রয় করলাম। কিন্তু তা'তে আপনার ত কোন লাভ নেই। আমাদের প্রাণ তো ক্রয় করতে পারবেন না।

যোগেশ। পারবো না কি ব'লছো হে তুমি? এ নন্দনপুর গ্রামে, আমাকে ছেড়ে একটা সমাজের কল্পনা করে যা'রা, তা'রা তো বদ্ধ পাগল।

শচীন। তবে কি আপনি বলতে চান, গ্রামবাসী যাঁরা সব এখানে এসেছেন, সকলেই পাগল।

যোগেশ। পাগল ত বটেই। আমি এদের জন্য গারদের ব্যবস্থা কচ্ছি।

শচীন। এখনো বলছি এ প্রস্তাবটা আজ ছেড়ে দিন।

যোগেশ। না হ'লে কি হ'বে বল শুনি? যোগেশবাবুকেও ভয় দেখাচ্ছ নাকি? আমি সকলকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি; হীরালাল এ বাড়ীতে আছে বলে আজ তোমরা আমার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছ কি না?

' কাশীবাচস্পতি কহিলেন, "আপনি দেশের জমিদার, ধর্ম্মের রক্ষক। যে কাজে ধর্ম্মহানি হয়—এমন কাজ করতে আপনি কেন অগ্রসর হয়েছেন?"

যোগেশবাবু কহিলেন, "ও সব বুজরুকি আমি শুনতে চাই না। কে আছিস্ রে এখানে, আয় তো—"

একজন দরোয়ান যোগেশবাবুকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

যোগেশবাবু হুকুম দিলেন, "এই বাচস্পতিকে দেউড়ী ঘরে

নিয়ে যা'—আজ শিখিয়ে দেবো যে সকল জায়গায় স্বাধীন মত খাটে না।"

দরোয়ান বাচস্পতি মহাশয়ের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল।

উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া শচীন কহিল, "সাবধান যোগেশবাবু, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করবেন না।"

ক্রোধান্ধ যোগেশবাবু শচীনকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিলেন।

দরোয়ান বাচস্পতির হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

বাচস্পতিকে দরোয়ানের হস্ত মুক্ত করিয়া শচীন কি বলিতেছিল, এমন সময় তুইজন সর্দ্দার আসিয়া শচীনকে ধরিয়া দাঁড়াইল। ক্রোধদীপ্ত নয়নে যোগেশবাবুর প্রতি চাহিয়া শচীন বলিল, "দানবের অত্যাচারে দেবতারা স্বর্গচ্যুত হ'য়েছিলেন ব'লে জগতের চক্ষে তাঁরা হীন হ'য়ে যান নি। বরং সে অত্যাচার দানব-ধ্বংসের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিল। জানবেন যোগেশবাবু, দরিদ্রের প্রতি এ উৎপীড়ন একদিন কাল সাপের মূর্ত্তি ধ'রে আপনাকে দংশন করবে।"

একজন সর্দ্দারের প্রতি যোগেশবাবু কহিলেন, "দেও তো বেশ ক'রে এ মুখর ছোকরার কাণটা মলে।"

কখন যে অনিল আসিয়া এ দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। শচীনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে বলিয়া উঠিল, "এ হুকুমটা আপনি ফিরিয়ে নিন্ মামাবাবু! এত বড় একটা অন্যায়ের ভারে এ বাড়ীটা শুদ্ধ ভেঙ্গে পড়বে।"

অনিলকে গ্রামবাসিগণের পক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া যোগেশবাবুর ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি বলিলেন, "এখানে তোর কি দরকার রে হতভাগা! সরে যা বলছি এখান থেকে!"

অনিল কহিল, "নইলে কি করবেন মামাবাবু! মারবেন। মারুন না আমাকে যত ইচ্ছে। কিন্তু নীরিহ বেচারাদের প্রতি অযথা অত্যাচার করবেন না।"

যোগেশবাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "খুব বড় বড় কথা ত মুখস্থ ক'রে ফেলেছিস্ দেখ্‌ছি।" একজন সর্দ্দারকে বলিলেন "নিয়ে যা ত এ অনিলটাকে আমার কাছ থেকে।"

সর্দ্দার অনিলের হাত ধরিল।

বিস্ফোরক পদার্থে অগ্নি সংযুক্ত হইলে যে অবস্থা হয়, সর্দ্দারের হস্তস্পর্শে অনিলের অবস্থাও তেমনি হইয়া দাঁড়াইল। পা হইতে জুতা খুলিয়া সর্দ্দারটাকে এমনি প্রহার করিল যে চেতনাহীন অবস্থায় সে ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

যোগেশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার ক্ষমতা পরিচালনার শক্তিকে প্রশংসা না ক'রে থাকতে পাচ্ছিনা মামাবাবু! কুকুরের অধম একটা চাকর সে কিনা আপনার হুকুমে আপনার সাম্‌নে অনায়াসে আমার হাত ধরে দাড়াল!"

বিষয়টা বড়ই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া যোগেশবাবুর একজন কর্ম্মচারী অনিলকে একরকম জোর করিয়া সেই গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া গেল।

যোগেশবাবু দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "আমার পূর্ব্বের হুকুম !"

তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালিত হইল।

যন্ত্রণায় যতদূর না হউক, লজ্জায় ও অপমানে শচীনের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। বলিল, "এ অত্যাচারে আপনি আমাদের শক্তি বাড়িয়ে দিলেন যোগেশবাবু! এতে আমাদের মস্তক অবনত হ'বে না। আমার দেহের এ রক্তবিন্দুগুলি আমারই জয়মাল্য আর আপনার কলঙ্কের চিহ্ন। আপনার অত্যাচার-উৎপীড়নকে পদাঘাত করতেও আমার লজ্জা হচ্ছে।"

যোগেশবাবু ক্রোধের বেগ কোনমতে দমন করিতে পারিলেন না। স্বহস্তে প্রহার করিয়া শচীনের দেহ রক্তাক্ত করিয়া দিলেন।

শচীন কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যাইতেছিল। এমন সময়, "কি সর্ব্বনাশ করলি যোগেশ," বলিতে বলিতে আনন্দময়ী আসিয়া শচীনকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। শচীন তখন সংজ্ঞাশূন্য।

রমা ও সরযূ আনন্দময়ীর সঙ্গে আসিয়াছিল। শচীনের অবস্থা দেখিয়া—বৃদ্ধার আর্ত্তনাদে তাহাদের করুণ প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

সরযূ কহিলেন, "এ সব কি দাদা! এমন ক'রে শচীনকে মারবার আপনি কে? এতগুলি লোক এখানে পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। এ'দের দেহে প্রাণ আছে ব'লে ত বিশ্বাস হয় না। থাকলে বোধ হয় এরা এ দৃশ্যের মধ্যে স্থির হ'য়ে থাকতে পারতো না।"

"সত্যই এদের মানুষের প্রাণ নয়, মাসি মা! এরা সব দৈত্য-দানব" বলিয়া অনিল গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সরযূ। এ গৃহের বাতাস বিষাক্ত বলে বোধ হচ্ছে। আর ত এখানে থাকা চলে না। শচীনকে আমরা তোমার মহলে নিয়ে যাই,—চল মা!

আনন্দময়ীর চক্ষের জল মুছাইয়া রমা কহিল, "দাদাকে বলনা দিদিমা, শচীনঠাকুরকে তোমার ঘরে নিয়ে চলুক।"

রমা রুদ্ধ অশ্রু আর সম্বরণ করিতে পারিল না।

সরযূ। কাঁদবার এ সময় নয় রমা! এ ব্রাহ্মণ সন্তানের জীবনটা যাতে রক্ষা পায় আগে তার ব্যবস্থা কর্‌তে হ'বে।

অনিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কি কাণ্ডটাই না হ'য়ে গেল! কেনই বা ছাই এ ঘর ছেড়ে চলে গেলাম।

অনিল একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে যোগেশবাবুর প্রতি চাহিল। পরে অতি সাবধানে শচীনের দেহখানি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইল।

আনন্দময়ী, সরযূ ও রমা বিষাদ-প্রতিমার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিলেন।

১৮

দুই ভগিনীতে কথা হইতেছিল।

দীপ্তি কহিল,—"দাদাকে আর মোটেই বাড়ীতে দেখিনা। পরের জন্য যেন সমস্ত প্রাণটা সঁপে দিয়েছেন।"

তৃপ্তি। দাদা ত ঠিকই কাজ করে যাচ্ছেন। মানুষ যত বেশী নিজের দিকে চেয়ে দেখে—আত্মসেবার জন্য যত বেশী অধীর হয়, প্রাণটা তার তত বেশী ছোট হ'য়ে যায়। দাদার প্রাণটা মুক্ত আকাশের মত—নিজের কথা ভাবতেও তিনি অবসর পান না।

দীপ্তি। সে জন্য দাদাকে দোষ দিচ্ছি না তৃপ্তি! তবে তাঁর কাজের সীমা নাই।

তৃপ্তি। অসীমের মধ্যে যে আপনাকে মিশিয়ে দেয়, তাঁর কাজের সীমা কেমন ক'রে খুঁজে পাবে বলত?

দীপ্তি। দাদা আমাদের গৌরব। দুঃখীর চোখের জলটুকু মুছিয়ে দেবার জন্য যেন তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত হ'য়ে আছেন। ভগবানের উপর তাঁর যে অনন্ত বিশ্বাস, আর ভক্তি!

তৃপ্তি। ভক্তি জিনিষটা লাভ করা বড় শক্ত কেমন দিদি?

দীপ্তি। ভগবানের প্রিয় কাজগুলি ক'রে গেলে তাঁর উপর ভক্তি যে আপনি এসে পড়ে। শক্ত বল্‌ছো কেন তৃপ্তি?

তৃপ্তি। সে কাজের সংবাদ কেই বা রাখে, আর ক'জনেই বা জানে!

দীপ্তি। একবার ভাল ক'রে জগতের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেই ত সে কাজগুলি চোখের সাম্‌নে এসে পড়ে। ভোগ ছেড়ে ত্যাগের সাধনা কর্‌লে, আত্মসেবায় প্রাণ উৎসর্গ না ক'রে পরের সেবায় প্রাণটাকে ঢেলে দিলেই ত ভগবান সন্তুষ্ট হ'ন। জগতের প্রত্যেক জিনিষই ত সে কথা বল্‌ছে।

বাহিরের উত্তেজিত কণ্ঠের কলরবে উভয় ভগিনী চমকিয়া উঠিল। আচার্য্য পূজা করিতেছিলেন। বামধনপণ্ডিত পূজা গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "একবার ওঠো দাদা, বড় ভয়ানক সংবাদ।"

আচার্য্য ফিরিয়া চাহিলেন।

পণ্ডিত কহিতে লাগিলেন, "যোগেশবাবু আমাদেব ডাকিয়ে নিয়েছিলেন। শচীনের উপর বড়ই অবিচাব হয়ে গেছে। নিজের বক্ত দিয়ে সে আমাদেব লাঞ্ছনা রোধ কর্‌তে চেষ্টা ক'রেছিল, কিন্তু তবুও সে তা পেরে ওঠেনি।"

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "শচীন কোথায়?"

পণ্ডিত। তা'কে আমরা নিয়ে আস্‌তে পারি নাই। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় গিন্নিমা শচীনকে তাঁর নিজের মহল্লায় নিয়ে গেছেন আমাদের বাঁচাতে গিয়ে সে বুঝি নিজের প্রাণই বলি দিয়েছে।

আচার্য্য স্থিরভাবে চাহিয়া রহিলেন। তৃপ্তি কাঁদিয়া উঠিল।

দীপ্তি বলিল, "পণ্ডিত কাকা, দাদা বেঁচে আছেন ত?"

পণ্ডিত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বেঁচে আছে—কিন্তু স নরপশুর নির্দ্দয় প্রহারে শচীন যে মৃতকল্প হ'য়ে গেছে। স্তব্ধের মত দাঁড়িয়ে চোখের উপর সে দৃশ্য দেখ্‌তে হ'লো। প্রতীকার করবার কোন ক্ষমতা তো আমাদের ছিল না। সে বুকফাটা দুঃখ বুকে চেপে রেখে প্রাণহীণ পুতুলের মত আমরা সব দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

যুক্তকরে আচার্য্য বলিয়া উঠিলেন, "নারায়ণ, তুমিই আজ আমার পুত্রের গৌরব বাড়িয়ে দিলে। অত্যাচার উৎপীড়ন উপেক্ষা ক'রে, পুত্র যে আমার ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করতে শিখেছে সেও ত তোমারই আশীর্ব্বাদ প্রভো।"

ততক্ষণ গ্রামের বহুলোক আচার্য্যের প্রাঙ্গনখানি পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সকলের ভাবই যেন একটু উত্তেজনামাখা। পুলিশে সংবাদ পাঠাইয়া এ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে যেন সকলেই উৎসুক।

আচার্য্য কহিলেন, "ভগবানের চরণই আমার পুলিশ, বিচারালয়। চল ভাই সব, গিন্নিমার কাছ থেকে আমার বিজয়ী পুত্রকে চেয়ে নিয়ে আসি।"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "এ ব্যবস্থা ঠিক হ'ল না আচার্য্য দাদা। এতে যোগেশবাবুর সাহস বেড়ে যাবে। নিরাপদে এখানে বাস করা কারো পক্ষে সম্ভব হ'বে না।"

আচার্য্য কহিলেন, "তা' নয় ভাই, প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা না ক'রে, ক্ষমাতেই যোগেশবাবুর শাস্তি অধিক হ'বে।"

এমন সময় দুখানি পাল্কী আসিয়া সেখানে নামিল।

আনন্দময়ী রমার সহিত একখানি পাল্কী হইতে বাহির হইয়া আচার্য্যকে বলিলেন, "পুত্রের পাপ কাঁধে ক'রে তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি বাবা! আর কিছু ত আমার বল্‌বার অধিকার নাই।"

প্রাণ-ঢালা মমতার এমনি একটা গুণ আছে যাহাতে পরম শত্রুও বশ হইয়া পড়ে। আনন্দময়ীর স্নেহে, সরযূর শুশ্রূষায়, রমার যত্নে যোগেশবাবুর অমানুষিক অত্যাচারটা ও যেন শচীনের দেহে কোন যন্ত্রণার সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

শচীন ধীরে ধীরে বলিল, "কেন আপনি লজ্জিতা হচ্ছেন ঠাকুরমা! দেহে ত আমার কোন বেদনা নেই। আপনাদের অমৃতমাখা স্নেহধারায় আমার দেহ মন যে সুধা-সিক্ত হ'য়ে গেছে।"

আনন্দময়ী। এ অগ্নি-পরীক্ষায় তোমার শির যে দাদা, বিজয় গৌরবে উন্নত হ'য়ে উঠেছে; আর আমরা যে অপ-রাধের ভারে একেবারে নত হ'য়ে গেছি।

আচার্য্য। তুমি এসে এখানে দাঁড়াতেই যে যোগেশবাবুর সব অপরাধ হাল্‌কা হ'য়ে গেছে মা! আমি দেখেই বুঝেছি এক স্নেহময় স্বর্গরাজ্যের ছায়াশীতল ছবি নিয়ে শচীন আমার ফিরে এসেছে। এসো মা, দরিদ্রের কুটীর আজ দেবীর পাদস্পর্শে পবিত্র হোক।

পাল্কী হইতে শচীনকে তুলিয়া সকলেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আচার্য্য সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শচীনের মুখেত যন্ত্রণার চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না—সেখানে যেন একটা কর্ত্তব্য সাধনের উজ্জ্বল প্রভা খেলে বেড়াচ্ছে। তোমরা তবে এখন এসো ভাই সব।"

আচার্য্যের ব্যবহারে সকলেই যেন একটু বিস্মিত। তাঁহার কথার উপর কোন কথা না বলিয়া একে একে সকলেই সে স্থান ত্যাগ করিল।

আনন্দময়ীর সহিত অনিলও আসিয়াছিল। শচীনকে বিছানায় রাখিয়া বলিল," মাথার কাছে বসে একটু বাতাস কর তো রমা! এই মালিসের ঔষধটা একটু গরম ক'রে আন্‌তে হ'বে।" তৃপ্তি শিশিটা লইয়া ঔষধ গরম করিতে গেল।

আচার্য্য রমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর্ত্তের সেবাতেই যে তোদের সৌন্দর্য্য আরও বেড়ে ওঠে। মা লক্ষ্মীর আগমনে যে আমার গৃহ আজ নন্দনকাননে পরিণত হয়েছে।" মালিসের ঔষধ আনিয়া দীপ্তি তৃপ্তিও শচীনের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

১৭

এক নীরব সন্ধ্যায় সরযূ, অনিল ও রমা বৃদ্ধা আনন্দময়ীকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল।

সরযূ কহিলেন, "মা, আর আমার এখানে এক মুহূর্ত্ত ও থাক্‌তে ইচ্ছে নেই। চোখে যা' কিছু পড়্‌ছে সব যেন অদ্ভুত ব'লে মনে হয়। ঠাকুরের পদতলে বসে যে শিক্ষা পেয়েছি—সংসারটা ত সে শিক্ষার উপযুক্ত স্থান ব'লে বোধ হচ্ছে না। এ গোলমাল থেকে দূরে সরে না গেলে প্রাণটা বুঝি শান্ত হ'বে না।"

আনন্দময়ী। আমিও এই কথাই ভাব্‌ছি সরযূ! মনের গতি অনুসারেই জগতের চিত্রটা বাইরের চোখে ফুটে ওঠে। এখানে থাক্‌লে মনের গতিটা যে ভুল—পথে যাবে না, তা'র ত স্থিরতা নেই। সন্তান-স্নেহে মা যে অন্ধ হ'য়ে যায় সরযূ! যদি বাস্তবিকই আমি তেমনি অন্ধ হ'য়ে পড়ি। কাজ নেই আর এখানে থেকে।

সরযূ। কাশীতে আমার বাড়ী প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। সেখানে গিয়েই আমার কাজ আরম্ভ কর্‌বো। মা, আমাকে যে দেখে সেই বলে সংসারের সকল সুখ থেকে আমি বঞ্চিত। আমার কিন্তু তা' মনে হয় না। সংসারে কত কাজ পড়ে আছে। সে কাজের মধ্যে ডুবে থাক্‌লে অসুখ কি কাছে আস্‌তে পারে?

আনন্দময়ী। তুই যে বিধবা মা, সেই জন্যই লোকে তোর দুঃখে এ সব কথা বলে।

সরযূ। ঠাকুর বলেন, স্বামী জীবিত থাক্‌লেও রমণী বিধবা হয় যদি সে রমণী তা'র স্বামীকে প্রাণের মধ্যে পবিত্র ভাবে স্থান দিতে না পারে। আর স্বামী ইহলোকে না থাক্‌লেও যে রমণীর স্মৃতিতে তার স্বামী নিয়ত বিরাজ করে,—যে রমণী প্রাণের ভক্তিপুষ্পে নিয়ত তা'র স্বামী দেবতার পূজা কর্‌তে পারে—সে রমণী ত চির-সধবা। আমিও ত মা, ঠিক সেই কথাই মনে করি। তবে মানুষেরা সব এমন কথা বলে কেন?

আনন্দময়ী। ঠাকুরের কথা ত মিছে নয় মা। দেবতা দূরে থাক্‌লেও যেমন ভক্তের কাছে প্রাণের মধ্যে বিরাজ করেন—তেমনি স্বামীর প্রতি যা'র ভক্তি আছে—সে রমণী মৃতপতির অস্তিত্ব দিবা-নিশি প্রাণের মধ্যে অনুভব ক'রে—সে রমণী ত বিধবা হ'তে পারে না। সকলে বোঝে না ব'লেই এমন কথা বলে বেড়ায়।

অনিল ও রমা নিঃশব্দে মাতা ও কন্যার কথা শুনিতেছিল।

অনিল কহিল, "মাসিমার কাছে আজ একটা নূতন কথা শিখ্‌লাম। ঠাকুর নিজে আর তা'র সব শিষ্যগুলিই যেন নূতন রকমের। সাধারণ লোকের সঙ্গে তাঁদের মোটেই মিশ খায় না।"

সরযূ। কাশীতে গিয়ে আমি উঠলে, তোরা একবার সেখানে যাবিত অনিল? শচীনকে আর তোকে আমার খুবই দরকার হ'বে। যে উদ্দেশ্যে আমার হাতে এত অর্থরাশি প্রদত্ত হ'য়েছে, আমি যা'তে সে অর্থের সদ্ব্যবহার কর্‌তে পারি, তা'র বিধান ত আমার মত একলা রমণীর পক্ষে অসম্ভব। আর সে বিধান কর্‌তে না পার্‌লে ত আমার স্বামীর আত্মা তৃপ্ত হবে না।

অনিল। কেন যা'ব না মাসিমা? শচীন-দা'কে যদি তুমি কাজের ভার দেও, তবে তোমার অর্থে জগতের কত যে ভাল কাজ হবে, তা আমি ধারণাই করতে পাচ্ছিনা।

আনন্দময়ী। এ টাকা পয়সার গোলমালে শচীন এলে হয়?

অনিল। আমি জোর করে তাকে টেনে নিয়ে যাব। মানুষের মঙ্গল যাতে হতে পারে এমন কাজ না ক'রে শচীন-দা, কখনও চুপ করে থাকবে না।

আনন্দময়ী। এত গুণ মেয়েটার আমার, তবু বিধাতা কেন একে স্বামী-হারা করলেন? কোন দুঃখ ত ছিল না! অগাধ অর্থ—দেবতার ন্যায় স্বামী—ফুলের মত পবিত্র স্বভাব! সবই ভগবানের খেলা!

সরযূ। তোমার মুখে এ কথাতো ঠিক মানাচ্ছে না মা। ভগবান ত আমার প্রাণে অশান্তি-বৃক্ষ রোপন করেন নি।

আনন্দময়ী। তবুও ত তুই একলা।

রমা। না দিদিমা! স্বামীকে হারিয়েছেন বলে ত মাসিমার ধারণা নেই। কি চমৎকার ভক্তি!

সরযূ রমার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "স্বামী ইহলোকেই থাকুন আর পরলোকেই থাকুন—তিনি আছেন ঠিকই—স্ত্রীর কাছে ত তাঁর মত ভক্তির পাত্র আর কেহই নেই মা!"

২০

হেমলতার পত্রের উত্তর আসিল—বিদ্রোহী মহালটা শাসন করিবার জন্য বিজয়বাবুকে সেখানে আরও কিছু দিন থাকিতেই হইবে। হেমলতাকে লইয়া যাওয়াও এখন তেমন নিরাপদ নহে।

এ উত্তরে হেমলতার বুকের বল কমিয়া গেল। তিনি কল্পনায় যে আশ্রয়টাকে অবলম্বন করিয়া নিজের দুর্ব্বলতা দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সে আশ্রয়টাকেও ত তিনি হাতের কাছে পাইলেন না।

বিজয়বাবুর প্রতি হেমলতার বড়ই রাগ হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—আপনাকে সযত্নে রক্ষা করার চেষ্টাটা হেমলতার যেমন কর্ত্তব্য—বিজয়বাবুরও কি সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত নয়? হেমলতা যে বড়ই আকুল ভাবে বিজয়বাবুকে ডাকিয়াছিলেন—বড়ই আগ্রহের সহিত বিজয়বাবুর কাছে যাইতে চাহিয়াছিলেন। বধিরের মত বিজয়বাবু ত সে ডাক শুনিলেন না—সে আগ্রহের আহ্বানেত হেমলতাকে কাছে লইয়া গেলেন না। হেমলতা যেন কেমন হইয়া গেলেন।

বিমল আসিয়া বলিল, "পিসিমা, মাষ্টার ম'শায়ের বড় অসুখ। সকাল বেলা সামান্য জ্বর হ'য়েছিল। এখন কিন্তু গায়ে হাত রাখা যায় না।"

হেমলতার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। বলিলেন, "দেওয়ান-

জিকে একজন ডাক্তার ডেকে আন্‌তে বলে দে। আপনার লোক কাছে নেই ব'লে বেচারা যেন কষ্ট না পায়।"

বিমল। আমি এখনি যাচ্ছি। একটু সাবু গরম ক'রে যদি পাঠিয়ে দেও, তবে ভাল হয়।

হেমলতা। বামুনঠাকুর এখনও আসেনি। আচ্ছা, আমি নিজেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুই যা, ডাক্তার এসে কি বলে আমাকে জানিয়ে যাস্।

হেমলতা তবুও একটা কাজ খুঁজিয়া পাইলেন, এবং সেই সঙ্গে মাষ্টারের সুন্দর মূর্ত্তিখানিও তাঁহার প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর বিমল জানাইল—ডাক্তারের মতে জ্বরটা খারাপ। তবে ভয়ের কারণ নেই। রাত্রি দশটার সময় তিনি আবার আস্‌বেন। দরকার হ'লে রাত্রিতে থাক্‌বেন।

হেমলতা কহিলেন, "ডাক্তার না আস্‌তে একবার তোর মাষ্টার ম'শায়কে দেখে আসি চল, বিমল!"

রোগীর গৃহে যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হইতে পারে, এক জন চাকরের দ্বারা সেগুলি নরেশের গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

নরেশের গৃহে প্রবেশ করিয়া হেমলতা দেখিলেন, রোগী অবশ ভাবে পড়িয়া আছেন। কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড়ই কি কষ্ট হচ্ছে আপনার?"

নরেশ হেমলতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তেমন কষ্ট কিছু হচ্ছে না। তবে জ্বরটা খুব বেশীই হ'য়েছে।"

হেমলতা। আপনার বাড়ীতে খবর পাঠাব কি ?

নরেশ। এখন দরকার নেই। বোধ হয় দু'এক দিনেই আরাম হ'য়ে যাব। অবসর মত তুমি এক একবার আমাকে দেখে যেও।

নরেশ বড়ই করুণ দৃষ্টিতে হেমলতার মুখের দিকে চাহিলেন।

হেমলতা যে চিন্তাটাকে হৃদয় হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; সে চিন্তাটাই এখন আবার এমনি ভাবে তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিল যে সেটাকে তাড়াইবার আর কোন উপায় রহিল না। হেমলতা ভাবিতে লাগিলেন, এমন করিয়াই বুঝি মানুষ বিপদে পড়ে—আর এই বিপদের মধ্যেই বুঝি মানুষের খাঁটি পরীক্ষা।

হেমলতা প্রকাশ্যে বলিলেন, "অবসর পেলেই আমি আস্‌বো। আপনি কোন সঙ্কোচ কর্‌বেন না। যখন যা' প্রয়োজন হ'বে বিমলকে দিয়ে বলে পাঠাবেন।"

নরেশ। তা' পাঠাব। সঙ্কোচ ত আমার মোটেই নেই।

নরেশ পুনরায় হেমলতার প্রতি তেমনি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

হেমলতা কহিলেন, "এখন আমি আসি। সকাল বেলা আবার দেখে যাবো।"

নরেশ কোন উত্তর করিলেন না। একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন মাত্র।

২১

নরেশের অসুখ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়িয়া হেমলতা যেন একেবারে হাঁপাইয়া উঠিলেন।

মাষ্টার তাঁহার কেহই নহে। তবু হৃদয়ের তারগুলি ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।

বাণবিদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় তিনি সমস্ত দিন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নারী-হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলিকে যতই তিনি সংযমের বাধনে বাধিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সেগুলি যেন ততই বেশী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন, সম্মুখে তাঁহার অগ্নি-পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় বুঝি বা তাঁহার সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইয়া যায়।

রোগীর গৃহসংলগ্ন দরজার নিকট দাড়াইয়া হেমলতা অনেক সময় রোগ-ক্লিষ্ট মাষ্টারের মুখখানির প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। রোগ যন্ত্রণা যখনই মাষ্টারের মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত, হেমলতা ভাবিতেন, কাছে বসিয়া একটু গায়ে হাত বুলাইয়া দিলে বুঝি এ যন্ত্রণার কিছু লাঘব হইত। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও, তিনি তাহা পারিতেন না। মাষ্টার যে তাঁহার কেহই নহেন।

এক নীরব সন্ধ্যায় হেমলতা তেমনি করিয়াই দরজার সম্মুখে দাড়াইয়া আছেন। মাষ্টারের অসুখ সে দিন অনেক পরিমাণে কম।

তৃষ্ণার্ত্ত মাষ্টার একটু জল চাহিলেন। একবার বিমলকে ডাকিলেন। সে গৃহে তখন অন্য কেহ উপস্থিত ছিল না, কাজেই মাষ্টার আবার নীরবে নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

মাষ্টারের শুষ্ককণ্ঠে একটু জল ঢালিয়া দিতে হেমলতার প্রাণটা যেন অস্থির হইয়া উঠিল। ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না।

প্রাণে পাপ থাকিলে, সঙ্কোচ যেন আপনি আসিয়া পড়ে। চিরপরিচিত নরেশের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে আজ যেন হেমলতা বিষম লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলেন। এ সঙ্কোচ ত পূর্ব্বে ছিল না। পাপ-চিন্তায় হেমলতার প্রাণে নরেশ সম্বন্ধে এ লজ্জার ভাব নূতন সৃষ্ট।

অল্পক্ষণ পরেই মাষ্টার পুনর্ব্বার জল চাহিলেন। তাঁহার সেই ক্ষীণ কণ্ঠের কাতরতা-মাখা প্রার্থনা হেমলতা আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি রোগীর গৃহে প্রবেশ করিয়া জলহস্তে মাষ্টারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

তন্দ্রাগত মাষ্টার হেমলতার উপস্থিতি জানিলেন না।

হেমলতা বড়ই বিপদে পড়িলেন। এ সময়ে মাষ্টারের গৃহে আসিতে পারেন, ইহার কোন সঙ্গত কারণই তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। কাজেই ডাকিয়া জল দিতে তাঁহার বড়ই লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। অসাবধান বশতঃ গ্লাস হইতে খানিকটা জল মেঝেয় পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে হস্তের অলঙ্কারগুলিও শব্দ করিয়া উঠিল।

মাষ্টার সে দিকে চাহিলেন।

হেমলতা সঙ্কুচিত ভাবে মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মাষ্টার কহিলেন, "দেবীরূপে আমার প্রাণ বাঁচাতে তুমি এসেছ! দেও একটু জল আমার গলায় ঢেলে দেও। আমার ত উঠে বস্‌বার শক্তি নেই।"

হেমলতা কোন উত্তর করিলেন না। ধীরে ধীরে মাষ্টারকে জলপান করাইতে গেলেন।

মাষ্টারের অঙ্গ-স্পর্শে হেমলতার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে কম্পনের ফলে গ্লাসের জল অধিকাংশই মাষ্টারের শরীরে পড়িয়া গেল।

নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া হেমলতা শুষ্ক বস্ত্রে সে জল মুছিয়া দিলেন।

ধীর কণ্ঠে মাষ্টার বলিলেন, "বড়ই প্রয়োজনের সময় তুমি আমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছ হেম!

হেমলতা প্রাণহীন প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। নরেশের সহিত কথা কহিতে এমন লজ্জা ত তিনি পূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করেন নাই।

নরেশ কহিলেন, "এ জলটুকু না পে'লে আমার যে কি কষ্ট হ'তো!"

হেমলতা ধীর ভাবে বলিলেন, "আপনাকে একলা ফেলে

যাওয়াটা ত খুবই অন্যায় হ'য়েছে। যদি আমি এখানে না আসতাম?"

মাষ্টার। এমনি ভাবে আমার প্রাণ রক্ষা করাই যে বিধাতার ইচ্ছা। তুমি না এসে পারবে কেন হেম?

হেমলতা নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইলেন। বলিলেন, "আমি তবে এখন আসি।"

নরেশ স্থির দৃষ্টিতে হেমলতার মুখের প্রতি চাহিলেন। সে দৃষ্টি হেমলতার বক্ষ ভেদ করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে গিয়া পৌঁছিল। হেমলতা দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

২২

ঘুমের চক্ষে উঠিয়া হেমলতা দেখিলেন, বিজয়বাবু তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ক্লান্ত ভাবে একখানি চৌকিতে বসিয়া বিজয়বাবু বলিলেন, "বড়ই বিপদে পড়িয়াছি হেম! বিদ্রোহী মহালে একটা খুন হ'য়ে গেছে। দিন কত আমাকে গা' ঢাকা দিয়ে থাকতে হ'বে।"

বিস্মিত ভাবে হেমলতা কহিলেন, "খুন করেছ কি তুমি?"

বিজয়। তা' নয়। আমি তখন মহলে উপস্থিত ছিলাম।

হেম। খুন যদি তুমি ক'রে না থাক, তবে তোমার ভয় কিসের?

বিজয়। তুমি তা' বুঝবে না হেম! আমার লোকেরাই ত খুন করেছে। খুন করতে হুকুম আমি দেই নাই; কিন্তু সে কথাতো কেউ শুনবে না।

হেম। কি হবে এখন তবে?

বিজয়। মোকদ্দমার ফল কি হ'বে তা' এখন বলা যায় না। আমাকে কিন্তু এখন লুকিয়ে থাকতে হ'বে।

হেম। এ বাড়ীতে থাকবে ত'?

বিজয়। তা' হয় না হেম! যেতে হ'বে অনেক দূরে। এ রাত্রিতেই রওনা হ'ব।

হেম। এই এসে পৌঁছিলে আর এখনি চলে যা'বে!

যদি তাই কর্‌তে হয়, তবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। এখানে থাক্‌তে আমার ভাল লাগে না।

বিজয়। বড়ই ছেলে মানুষের মত কথা কইছ হেম! দেখ্‌ছো নিজেকে সাম্‌লে রাখ্‌তেই আমাকে বেগ পেতে হ'বে; তার উপর তোমাকে সঙ্গে রাখা, এ যে অসম্ভব প্রস্তাব হেম!

বিজয়বাবুর মুখের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া অধীর ভাবে হেমলতা বলিয়া উঠিলেন, "না—না—আমাকে এখানে একলা ফেলে রেখে যেও না। তোমার কাছে থাক্‌লে আমার সকল বিপদ কেটে যাবে।"

বিজয়বাবু বলিলেন, "আমার বিপদ তো তা'তে আরো বাড়্‌বে হেম!"

নিতান্ত নিরুপায় ভাবে বিজয়বাবুর কণ্ঠ ধারণ করিয়া হেমলতা কহিলেন, "এর কি কোন উপায় নাই?"

বিজয়। মোকদ্দমা শেষ না হ'লে ত অমি প্রকাশ্য ভাবে এখানে থাক্‌তে বা আস্‌তে পার্‌বো না। তোমার এখানে কিসের ভয় হেম! বিমল এখানে আছে। দেওয়ানজী রইল, বিমলের মাষ্টার নরেশ আমার বন্ধুপুত্র, কেন তুমি মিছে ভয় পাচ্ছো। এখানে অপেক্ষা কর্‌বার অবসর ত আমার আর নেই হেম!

বিজয়বাবুর বক্ষে মুখ লুকাইয়া হেমলতা কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল যে তিনি খুলিয়া বলেন—"বিমলের মাষ্টারকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হউক।" মুখে কিন্তু সে কথা ফুটিল না।

বিজয়বাবু হেমলতার প্রাণের ক্রন্দন ঠিক্ অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "তোমার চিঠি পেয়ে এখানে চলে এলে এ বিপদে পড়্‌তে হতো না হেম! মোকদ্দমায় আমি আটকাব ব'লে মনে হয় না, তবে সাবধান হ'য়ে থাকা ভাল।"

হেম। কবে তুমি ফির্‌বে?

বিজয়। হয়ত দু-মাস; কি তার অনেক পরে ও ফির্‌তে পারি।

হেম। এতদিন! না—না। এত বেশী দিন আমাকে এখানে ফেলে রেখো না।

বিজয়। এ ছাড়া ত উপায় নেই হেম! একটা কথা বলে যাই, যদি পার, অনিল ও রমাকে ফিরিয়ে এনো। যদি এমন হয়, আর আমি ফিরে না আসি—আমার হয়ে তুমি তা'দের কাছে ক্ষমা চেয়ে তা'দের অধিকার ফিরিয়ে দিও। কেন জানিনা, হঠাৎ এ কথাটা মনে জেগে উঠ্‌লো। আর ত দেরী কর্‌তে পারি না হেম!

বিজয়বাবু প্রস্থানের আয়োজন করিলেন।

হেমলতা বিজয়বাবুর বক্ষ-লগ্ন হইয়া নীরব রহিলেন। তাঁহার যেন বাক্-শক্তি লুপ্ত হইয়া গেল।

বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বিজয়বাবু কহিলেন, "তুমি যদি আদর ক'রে ডাক, অনিল ও রমা তবে নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বে।"

হেমলতার বাহুবন্ধন-মুক্ত বিজয়বাবু চলিয়া গেলেন।

হেমলতা নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে সেই গৃহ-প্রাঙ্গনে বসিয়া পড়িলেন।

বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া ঝি হেমলতার নিকটে দাঁড়াইল। হেমলতা বলিলেন, "কেন জানি না, আমার বড় ভয় হচ্চে আমায় ধ'রে ঘরে নিয়ে চল।"

২৩

নন্দনপুরে আর বেশী দিন থাকা অনিলের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। যোগেশবাবুর প্রতিকার্য্যেই যেন তাহার প্রাণটা বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে লাগিল। একদিন রমাকে নিভৃতে ডাকিয়া অনিল তাহার হৃদয়ের কথা বলিয়া ফেলিল, "আয় রমা, আমরা এখান থেকে চলে যাই। বাবার কাছে গিয়ে—তাঁর পায়ের তলায় বসে বিশ্রাম করি। সেখানে মাথা নীচু কর্‌লে ত কোন অপমান নেই।"

রমা বলিল, "আমিও ক'দিন থেকে ঠিক এ'কথাটাই ভাব্‌ছি দাদা! সন্তান হয়ে যদি পিতার স্নেহের অধিকারী না হ'তে পারি—একটা আঘাতেই যদি চিরদিনের জন্য পিতার স্নেহ-রাজ্যের সীমানার বাহিরে পড়ে থাকি—তবে তো এ সংসারে আমাদের জায়গা হ'বে না। তাই চল, দাদা! আমরা বাবার কাছে ফিরে যাই।"

অনিল। মা'য়ের অবহেলার কথাটা মনে হ'লেই যেন এ ইচ্ছাটা আর থাকে না।

রমা। এখানকার অবহেলার চেয়ে মা'য়ের অবহেলাটাই কি প্রাণে বেশী লাগ্‌বে দাদা?

অনিল। ঠাকুর বলেন—পিতার স্নেহের ভাণ্ডার অফুরন্ত। সেখানে গেলেই আমাদের অধিকার ফিরে পে'তে কোন কষ্টই লাগ্‌বে না।

রমা। এক একবার মনে হয়, ঠাকুরের পায়ের ছায়ায় যদি পড়ে থাকতে পারি, তবে বুঝি সকল কষ্টের শেষ হয়! ঠাকুরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে প্রাণটা যেন একেবারে জুড়িয়ে যায়। দুঃখকষ্ট সেখানে ঘেঁস্‌তে পারে না।

অনিল। ঠাকুরের হাতে গড়া শচীন-দা বাস্তবিকই একটা অভিনব মানুষ। এমন ক'রে পরের জন্ম আপনাকে সঁপে দেওয়ার অন্য দৃষ্টান্ত ত আমার চোখে পড়ে না। ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে পর্ব্বত যেমন উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে, শচীন-দা'ও তেমনি সহস্র অবিচার-অত্যাচার সহ্য ক'রে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

রমা। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ না পেলে কেউ এমন ভাবে থাক্‌তে পারে না। ইনি যে ভগবানের অতি প্রিয় সন্তান।

অনিল। আর একটা কথা তোকে বলিনি রমা! মামাবাবু আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছেন, যদি আর কখনও ঠাকুরের কাছে যাই বা শচীন-দা'র সঙ্গে বেড়াই তবে তিনি আমাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। কথাটা কেমন হ'লো জানিস্—স্বর্গের পথে হাঁট্‌তে দেখ্‌লে নরকের রাজা সাজা দিবেন। ঠিক না রমা?

রমা। এ'তে বল্‌বার কিছুই নেই! এখানে থাক্‌লে মামা বাবুর সঙ্গে না জানি কোন্ দিন তোমার মুখোমুখী ঝগড়াই বা হ'য়ে যায়!

অনিল। একেবারে অসম্ভব নয়। কি ঐ হীরালালটাকে আমি একদিন না শিখিয়ে ছাড়্‌বো না। ভারি আমার সাহেব

হয়েছেন! সে দিন ঠাকুরের নাম ক'রে কতই না ঠাট্টা হচ্ছিল আমি এসে পড়্তেই থেমে গেল।

রমা। ঝগড়ায় কাজ নেই দাদা! বাবার কাছে ফিরে যাওয়াই আমাদের সব চেয়ে ভাল। যদি ভগবান দিন দেন তবে ঠাকুরকে আমরা সেখানেই নিয়ে যাব। দীপ্তি, তৃপ্তি দু'জনেই সে সঙ্গে থাক্বে। সে বড় সুখের হ'বে।

অনিল। ঠাকুরের জন্যই এ জায়গাটা ছাড়্তে ইচ্ছে হয় না ধর্ম্ম বা দেবতার কথা কখনও ভাল ক'রে ভাবিনি। জীবনের সে দিকটা একেবারে অন্ধকার ছিল। ঠাকুরের কাছে থেকে সে দিকে যেন একটা ক্ষীণ আলোক-রেখা ফুটে উঠ্ছে বলে বোধ হচ্ছে। সেটুকু যে বড় লোভের জিনিষ রমা!

রমা। এমন দেশ-গুরুর পায়ের ধূলো গায়ে লাগ্লে ধর্ম্মের পথ যে আপনি খুলে যায়। তোমারও ঠিক তাই হ'য়েছে দাদা।

অনিল। চারিদিকে চেয়ে দেখ্লে মানুষগুলোকে যেন টুক্রো টুক্রো ব'লে মনে হয়। একজনের যা' আছে আর একজনের তা' নেই। কিন্তু ঠাকুর আমাদের একটা আস্ত মানুষ। তাঁ'র মধ্যে কোন কিছুরই অভাব নেই।

রমা। দিদিমাকে সঙ্গে ক'রে বিকেল বেলা ঠাকুরের পায়ের ধূলো নিতে যাবো। সেখানেই আমাদের বাড়ী যাওয়ার কথা ঠিক ক'রে আস্বো। তুমি তখন সেখানে থেকো কিন্তু।

২৪

কথা হইতেছিল ডাক্তারসাহেবের দ্বিতল প্রকোষ্ঠে বসিয়া। মুখার্জ্জিসাহেব শ্রীমতী বেলাকে বলিলেন, "নন্দনপুরে অর্থ ও শক্তির প্রতিযোগিতা বাস্তবিকই একটা দেখ্‌বার ও ভাব্‌বার বিষয় হ'য়ে উঠেছে। যোগেশবাবুর অর্থ আর শচীন, অনিল প্রভৃতির হৃদয়ের অদম্য শক্তি,—একটা প্রভুত্বের প্রয়াসী আর একটা সেবাপরায়ণ। একটা চায় বিনা আপত্তিতে সকলে তাঁর কাছে মাথা অবনত করুক, আর একটা চায় ন্যায়ের দোহাই দিয়ে সে দাবী অগ্রাহ্য কর্‌তে। জয়-পরাজয়ের শেষ দৃশ্যটা দেখ্‌বার জন্য প্রাণের আগ্রহ যেন ক্রমশই বেড়ে উঠ্‌ছে।"

বেলা। মানুষের যেমন কাজ করা উচিত, শচীন ঠিক্ সেই কাজই ক'রে যাচ্ছে। আমি তা'র বালিকা-বিদ্যালয় দেখেছি—রোগীর সেবায় নিজের প্রাণ কেমন ক'রে তুচ্ছ কর্‌তে হয়, বিপন্নের সাহায্য কর্‌তে গেলে দুর্ব্বল বাহুতে কেমন ক'রে শক্তির সঞ্চার হয়, তা'ও আমি শচীনকে দেখে শিখেছি। গ্রাম্য চাষাদের জন্য তার নৈশ বিদ্যালয় একটা বিরাট জিনিষ। সেখানে শুধু লেখা পড়ার কথা হয় না। চাষ আবাদের কথা, স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রস্তাব, সকল বিষয়েরই আলোচনা চলে। চিত্তের দৃঢ়তায়, চরিত্রবলে শচীন জগতের আদর্শ। যোগেশবাবুর প্রতিযোগিতায় সে পরাজিত হ'বে, এ সন্দেহ আমার প্রাণে একবারও জাগে না।

মিঃ মুখার্জ্জি। শচীনকে আমি বেশ চিনি। তা'র অনুষ্ঠিত অনেক কাজে সে আমার সহানুভূতি পায়। তা'র দরিদ্র-সেবার মধ্যে আমার ক্ষুদ্র শক্তিও নিযুক্ত হয়। কিন্তু সে যেমন এ কাজে একেবারে মনঃপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে—তুলনায় আমি তা'র কাছে দাঁড়াইবারও যোগ্য নই। শচীন তা'র বাপের উপযুক্ত সন্তান—বাপটি কিন্তু আরও সুন্দর। তিনি যেন পৃথিবীর মানুষই নহেন। ত্যাগের মধ্যে দৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠিত ক'রে, আসক্তির বন্ধন-পাশ একেবারে ছিন্ন ক'রে, কেমন যে সহজভাবে কর্ত্তব্য-গুলি ক'রে যাচ্ছেন, দেখ্‌লে প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না।

বেলা। সে বাড়ীতে আরও দু'টী রত্ন আছে। দীপ্তি, তৃপ্তি—আচার্য্যের শিক্ষার অতি উৎকৃষ্ট ফল। সে দিন লীলা বল্‌ছিল. দীপ্তি যা' বোঝে, তা'দের কলেজের বড় মেমসাহেবেরও সে জ্ঞান নাই।

মিঃ মুখার্জ্জি। পূর্ব্বে এই আচার্য্যের মত অনেক লোক ছিল ব'লেই ব্রাহ্মণ জাতিটার এত গৌরব ছিল। এখন বেশী নেই কাজেই হীনপ্রভ হ'য়ে পড়েছে। পৌত্তলিক ব'লে যাঁ'রা হিন্দুদের ঘৃণা করেন, তাঁ'রা যদি এই আচার্য্যের সঙ্গে দিনকতক প্রাণ খুলে মিশ্‌তে পারেন তবে বোধ হয় তাঁ'দের সে বিশ্বাস বদ্‌লে যায়।

বেলা। যেমন তোমার হ'য়েছে।

মিঃ মুখার্জ্জি। অনেকটা সত্য বই কি!

বেলা। অনিল ছেলেটিকেও আমার খুব পছন্দ হয়। সে যখন "বউদি" ব'লে কাছে এসে দাঁড়ায়—তার সেই সতেজ

সরলতামাখা সুন্দর মুখখানি দেখে তা'কে ভাল না বেসে থাকতে পারি না। ধনীর সন্তান—উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই, তাই সময়ে সময়ে চরিত্রের মধ্যে একটু কর্কশ ভাব ফুটে ওঠে। প্রাণের স্বাভাবিক সৎপ্রবৃত্তিগুলি কিন্তু তা'র বড়ই প্রশংসার যোগ্য। এরূপ চরিত্রের দোষটুকু বাদ দিতেই যেন বেশী ইচ্ছে হয়।

মিঃ মুখার্জ্জি। এদের সঙ্গে মিঃ হীরালালকে কাছে এনে দাঁড় করালে কেমন দেখায় বল ত ?

বেলা। মিঃ হীরালাল এদের কাছে এসে দাঁড়াতেই পারে না। মিঃ হীরালালের ব্যবহারটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। থিয়েটারের ব্যাপারে তা'র সঙ্গে একটু মেশামিশি হ'য়েছে সত্য, কিন্তু তা'কে আমি প্রশ্রয় দিতে চাই না।

মিঃ মুখার্জ্জি। মিঃ হীরালালকে বিলেতে পাঠিয়ে যোগেশ বাবুর যে অর্থব্যয় হ'য়েছে—এমন অপব্যয় বোধ হয়, যোগেশবাবু আর কোন কাজেই করেন নাই।

বেলা। লীলা অনেকক্ষণ বাগানে গেছে। চল একবার সে দিকে যাই। দু'টো মালীতে যে কাজ করতে না পারে, লীলা একলা সে কাজ করে।

মিঃ মুখার্জ্জি বেলার হাত ধরিয়া বাগানের দিকে চলিলেন।

২৫

প্রভাত ও সন্ধ্যায় পুষ্পকাননে কাজ করা লীলার একটা আনন্দ। বাগানের প্রত্যেক ফুলটির মধ্যেই যেন লীলার কোমল-স্পর্শ পরিস্ফুট। প্রত্যেক লতাটি যেন লীলার যত্নমাখা স্নেহে পরিসিক্ত।

অভ্যাস মত লীলা বাগানে কাজ করিতেছিল। কখন যে মিঃ হীরালাল তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা লীলা জানিতে পারে নাই।

সে নিদাঘ-অপরাহ্ণে পুষ্পকাননমধ্যে—লীলার নিঃসঙ্কোচ ভ্রমণ, মিঃ হীরালালের চক্ষে বড়ই মনোরম বোধ হইতেছিল।

এমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা যে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে, মুগ্ধ-দৃষ্টি মিঃ হীরালাল সে কথাটা ভাবিতেও যেন ভুলিয়া গেলেন। লীলার সৌন্দর্য্য তাঁহার নয়নে যেন একটা কুহকময় নূতন দৃশ্য-পটের সূচনা করিয়া দিল।

লীলা একটা গোলাপ ফুল তুলিতেছিল। অসাবধানতায় তাহার অঙ্গুলিতে কণ্টক বিদ্ধ হইল। যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিয়া ফিরিতেই লীলা মিঃ হীরালালকে দেখিতে পাইল।

আহত অঙ্গুলি হইতে অল্প অল্প রক্ত পড়িতেছিল,—দেখিয়াই মিঃ হীরালাল অগ্রসর হইলেন। সম্মুখে একটা টবে জল ছিল। রুমালখানা সেই জলে ভিজাইয়া মিঃ হীরালাল লীলার কণ্টক-

বিদ্ধ অঙ্গুলিটি চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বোধ হয় খুব লেগেছে তোমার—কত রক্ত পড়্ছে।"

"না—না, তেমন কিছু নয়। কাঁটার আঁচড় লেগেছে, এখনই সেরে যাবে। আপনি কেন রুমালখানা নষ্ট ক'র্লেন?" বলিয়া লীলা ধীরে ধীরে হীরালালের হাত ছাড়াইয়া একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি কখন এলেন?"

হীরালাল। এই ত আমি এসেছি। মিঃ মুখার্জ্জির সহিত একটা কথা ছিল। বাগানে এসেই তোমাকে দেখ্লাম। মনে ক'রেছিলাম মিঃ মুখার্জ্জিও বুঝি এখানে আছেন।

লীলা। দাদা বউদি'র সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে গল্প ক'র্ছেন দেখে এসেছি। সেখানে গেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

হীরালাল। এখন কি তাঁ'রা বাগানে আস্বেন না?

লীলা। ঠিক নেই। আস্তেও পারেন, না হয় বাইরে বেড়াতেও যেতে পারেন।

মিঃ হীরালালের প্রাণটা যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। অনেক দিন হইতেই লীলার সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এমন ভাবে লীলাকে দেখিবার অবসর পূর্ব্বে তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। হীরালাল তাঁহার প্রাণের কথাগুলি বলিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কেমন করিয়া যে সে প্রসঙ্গটা তুলিবেন, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। বলিলেন, "দেখ ত তোমার আঙ্গুলের রক্ত থেমেছে কি না?"

লীলা ধীরে ধীরে রুমাল খানা খুলিয়া ফেলিল। বলিল, "বেশী ত লাগেনি, রক্ত থেমে গেছে।"

হীরালাল। তুমি দাঁড়াও, আমি গোলাপটা তুলে দিচ্ছি। আমার আঙ্গুলে ফুট্‌তে বোধ হয় কাঁটার সাহস হবে না।

হীরালাল গোলাপটি তুলিয়া লীলার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "এমন সুন্দর গোলাপ ফুল, এর মধ্যে কাঁটার সৃষ্টি কেন?"

লীলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কাঁটা না থাক্‌লে—গোলাপফুল তোলাটা বড়ই সহজ হ'য়ে পড়্‌তো। ভাল জিনিষটা পেতে হ'লে একটু কষ্ট স্বীকার ক'র্‌তেই হয়।"

হীরালাল। তা' যে না পারে, ভাল জিনিষের প্রতি তার স্পৃহা থাকা উচিত নয়। লীলা—লীলা—আমি একটা ভাল জিনিষ পাবার জন্য এমন সহস্র কণ্টকের আঘাত সহ্য করতে প্রস্তুত আছি।

মিঃ হীরালালের কম্পিত কণ্ঠস্বর ও বচনবিন্যাসে লীলা চমকিয়া উঠিল। বলিল, "চলুন আমরা দাদার ঘরে যাই, সন্ধ্যে হয়ে এলো।"

হীরালাল। না লীলা,—এতদিন যে কথাগুলি প্রাণের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম, আজ তোমাকে তা' শুন্‌তে হবে।

লীলা। না—না, আমি এখন কোন কথা শুন্‌তে পার্‌বো না। আপনি পথ ছাড়ুন।

হীরালাল। এমন কোমল দেহ তোমার, হৃদয়টা এমন পাষাণ কেন? লীলা, একটু দাঁড়াও। প্রাণের কথা খুলে বল্‌তে এমন অবসর আর পাব কি না জানি না

দৃঢ়তার সহিত লীলা বলিল, "আমাকে এখানে রাখ্‌তে আর চেষ্টা করবেন না। আপনি সরে দাঁড়ান।"

মিঃ হীরালাল সাহেবি ধরণে লীলার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলেন। দুই হাত বক্ষে রাখিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "এত কঠোর হয়োনা লীলা! তোমার এ অবহেলায় আমার প্রাণটা একেবারে ভেঙ্গে যাবে।"

মিঃ হীরালাল উঠিলেন। হাত জোড় করিয়া বলিলেন,—"লীলা! ভিখারীর মত তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। তুমি একটু আশা দেও। আমি আজই মিঃ মুখার্জ্জির নিকট বিবাহের প্রস্তাব ক'র্‌বো।"

লীলার ধৈর্য্যের সীমা শেষ হইয়া গেল। কঠোর কণ্ঠে বলিল, "সাবধান মিঃ হীরালাল! আমাকে এমন ক'রে অপমান ক'র্‌বেন না ব'ল্‌ছি।"

হীরালাল। তোমাকে অপমান কেন ক'র্‌বো লীলা? যদি এ হৃদয়টা তোমাকে দেখান সম্ভব হ'তো, তা' হ'লে দেখ্‌তে—সেখানে কি লেখা আছে। আমাকে বাঁচাও লীলা, তোমায় না পেলে আমি...............

কথা শেষ না করিয়া মিঃ হীরালাল অধীর ভাবে লীলার হাত ধরিতে অগ্রসর হইলেন।

ভয়ে লীলা চীৎকার করিয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময়ে মিঃ মুখার্জ্জি শ্রীমতী বেলার সহিত বাগানে প্রবেশ করিলেন।

লীলার ভীতিচকিত দৃষ্টি ও আর্ত্তস্বর—মিঃ হীরালালের চঞ্চল ভাব, মুহূর্ত্ত মধ্যে শ্রীমতী বেলার চক্ষে সমস্ত ঘটনাটা স্পষ্ট ভাবে ফুটাইয়া দিল। তিনি কহিলেন, "এ কি ব্যবহার মিঃ হীরালাল? ভদ্র পরিবারের সহিত মিশিতে অধিকার পেয়েছেন ব'লে ত সেই পরিবারকে অপমান কর্‌বার অধিকার আপনাকে কেউ দেয় নাই।"

মিঃ হীরালাল কোন কথা না বলিয়া অপরাধীর ন্যায় অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শ্রীমতী বেলা আবার বলিলেন, "বোধ হয় আপনার মনে আছে একদিন আমার সঙ্গেও আপনি কবিতার ভাষায় কথা ব'ল্‌তে আরম্ভ ক'রেছিলেন! ভেবেছিলাম সেদিনকার লজ্জায় আপনার শিক্ষা হ'য়েছে। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আপনার মত লজ্জাহীন লোক ভদ্রসমাজে মিশ্‌বার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।"

আত্মদোষ স্খালনের জন্য হীরালাল কি বলিতেছিলেন। বাধা দিয়া মিঃ মুখার্জ্জি কহিলেন, "আপনার কোন কথা আমরা শুন্‌তে চাই না। চেয়ে দেখুন, লীলা এখনও কাঁপছে।"

বেলা লীলার নিকটে দাঁড়াইলেন। তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া বলিলেন, "আয় দিদি, আমরা এখান থেকে চলে যাই।"

মিঃ মুখার্জ্জি যখন বেলার সহিত বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেন, শচীন আর অনিল তখন বাগানের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়। লীলার চীৎকারে তাহাদের প্রতি মিঃ মুখার্জ্জির দৃষ্টি পড়ে নাই।

ঘটনাটা শচীন ও অনিল দু'জনেই বেশ বুঝিয়াছিলেন। মিঃ

হীরালালকে এই অবস্থায় দেখিয়া অনিল কহিল, "কি সাহেব, অমন ক'রে এখনও দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বেরিয়ে যাও বলছি এখান থেকে। নইলে মূর্খের প্রতি বাঙ্গলাদেশে যা' ব্যবস্থা আছে—জান তো?"

মিঃ হীরালাল একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অনিলের প্রতি চাহিলেন। একটু বিদ্রূপের সহিত অনিল বলিল, "এর পরেও দেখ্‌ছি সাহেব বাবুর রাগ আছে। এখনি দূর হও বল্‌ছি।"

হীরালাল মিঃ মুখার্জ্জির প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আপনার বাড়ীতে আমাকে এমন ক'রে অপমান—"

অনিলের আর সহ্য হইল না। মিঃ হীরালালের ঘাড় ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল, "তোর আবার মান অপমান কিরে ছুঁচো!"

মিঃ হীরালালকে বাগানের বাহিরে রাখিয়া অনিল ফিরিয়া আসিল। বলিল, "আজ রাত্রিতে নৈশ-বিদ্যালয়ে আপনাকে একবার যেতে হ'চ্ছে, মিঃ মুখার্জ্জি! আপনাকে ডাকতেই আমরা এসেছিলাম; কিন্তু এ বাঁদরটার যে এতদূর সাহস হ'বে, তা' তো কখনও ভাবিনি।"

মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন, "চল বাড়ীর ভিতর যাই। সেখানে গিয়েই সব কথা শুন্‌বো।"

২৬

ডাক্তারসাহেবের বাড়ীতে হীরালালের অপমান-কাহিনী অতিরঞ্জিত হইয়া যোগেশবাবুর কানে উঠিল। বিন্দুরাণী ভ্রাতার এ অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া যোগেশবাবুকে ধরিয়া বসিলেন, লীলার সহিত হীরালালের বিবাহ দেওয়া চাই ই। তাঁহার বিশেষ ক্রোধ হইল, শচীন আর অনিলের উপর।

বিন্দুরাণীর উত্তেজনায় ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া যোগেশবাবু অনিলকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

আনন্দময়ী ও রমা, অনিল ও হীরালাল ঘটিত সমস্ত ব্যাপারই শুনিয়াছিলেন। যোগেশবাবুর এ আহ্বানে—একটা অনর্থের সূত্রপাত-সম্ভাবনায় তাঁহারা ভীত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহারা দুইজনেই অনিলের সঙ্গে যোগেশবাবুর সমক্ষে উপস্থিত হইলেন।

যোগেশবাবু কহিলেন, "অনিল, আমার সকল কাজে বাধা দেওয়ার জন্যই কি তোমাকে কাঁধে ক'রে এখানে নিয়ে এসেছি? প্রজা হ'য়ে যা'রা আমাকে অপমান কর্‌তে চায়, আমার আধিপত্য নষ্ট কর্‌বার জন্য যা'রা দলবদ্ধ হ'য়ে ষড়যন্ত্র কর্‌ছে, তা'দের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমায় গৌরবহীন কর্‌বার পথ প্রশস্ত ক'রে দিতেই কি তোমাকে এখানে আনা হ'য়েছে?"

অনিল ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "তা' নয় মামাবাবু, আপনার

কাজে বাধা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করা প্রত্যেক মানবেরই অধিকারভুক্ত।"

যোগেশবাবুর ক্রোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "ন্যায় অন্যায় জ্ঞানটা কি একলা তোমারই আছে, না আমরাও তা' কিছু বুঝি? তোমাকে হাজার বার নিষেধ করেছি, তুমি বিদ্রোহী প্রজা শচীনের সহিত মিশো না। তুমি তার বিপরীত ব্যবহার করছো।"

বিস্ময়ের সহিত অনিল কহিল, "আপনি বিদ্রোহী বলছেন কা'কে মামাবাবু? শচীনের মত ন্যায়নিষ্ঠ প্রজা আপনার জমিদারীর গৌরববিশেষ। কয়েক দিনের পরিচয়ে আমি শচীনকে বেশ চিনেছি। সে ত সর্ব্বদাই আপনার মঙ্গল কামনা করে। অত উৎপীড়ন অত্যাচার সহ্য ক'রে, এক দিন ও ত সে আপনার অনিষ্ট চেষ্টা করে নি। আপনি কেন তা'কে বিদ্রোহী বলছেন?"

যোগেশ। কে আমার মঙ্গল কামনা করে বা না করে আমি না বুঝি এমন নয়! ডাক্তারসাহেবের বাড়ী হীরালালের অপমানটাও বোধ হয় আমার মঙ্গলের জন্যই করা হ'য়েছে!

অনিল একটু উদ্ধত ভাবে বলিল, "সত্যই তাই। ডাক্তার সাহেব আপনার পরিচয়ে হীরালালকে তাঁ'র পরিবারবর্গের সহিত মিশিতে অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু হীরালালের নির্লজ্জ ব্যবহার আপনার সুনামে আঘাত ক'রেছে।"

যোগেশ। হীরালাল কোন অন্যায় কাজ করেছে ব'লেত

আমার মনেই হয় না—লীলা অবিবাহিতা। হীরালাল তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব ক'রেছে। এ'তে অন্যায় যে কি হ'লো তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য।

অনিল। সে প্রস্তাব ভদ্রলোকের মত কর্‌লে কোন দোষ ছিল না, কিন্তু যে অবস্থায় যে ভাবে মিঃ হীরালাল লীলার কাছে এ প্রস্তাব তুলেছিলেন, সে রকমটা সকল ভদ্রলোকই ঘৃণা করেন। এ বিষয়ে হীরালালের পক্ষ সমর্থন করা নিতান্ত কাপুরুষের কাজ।

যোগেশবাবু ক্রোধের বেগ সাম্‌লাইতে পারিলেন না। বলিয়া উঠিলেন, "হতভাগা, আমার মুখের উপর আমাকে কাপুরুষ বল্‌ছিস্। দূর হ'য়ে যা' তুই আমার কাছ থেকে।"

অবিচলিত কণ্ঠে অনিল বলিল, "এখনি আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ আছে। যে রক্ত আপনার ধমনীতে প্রবাহিত হ'য়ে আপনাকে এমন তেজীয়ান্ করেছে, আমার ধমনীতে ও সেই রক্ত আংশিক ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। এ কথা মনে রাখ্‌বেন।"

রমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আয় রমা, আর আমাদের এখানে থাকা চলে না।"

আনন্দময়ী যোগেশবাবুকে বলিলেন, "এ কি ছেলেমানুষী কচ্ছিস্ যোগেশ! বরেন অবাধ্য হ'লে তুই কি কর্‌তিস বল্ ত?"

যোগেশ। তা' হলে বরেনকে কেটে ফেল্‌তুম।

ইহার উপরে আর কথা নাই।

রমা অনিলের গলা ধরিয়া বলিল, "এসো দাদা, আমরা দিদিমা'র ঘরে যাই।"

"না রমা, আর এখানে নয়," বলিয়া রমার হাত ধরিয়া অনিল সেই গৃহ হইতে বাহির হইল।

দরজার সম্মুখেই সরযূর সহিত বরেন দাঁড়াইয়াছিল।

রমা সরযূর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনিলকে কাছে টানিয়া লইয়া বরেন বলিল, "এমন ক'রে আমাদের মায়া কাটিয়ে যেওনা অনিল?"

সরযূর স্নেহমাখা মুখ, রমার কাতর ক্রন্দন, আনন্দময়ীর অসহায় করুণ ভাব, বরেনের আগ্রহযুক্ত আহ্বান অনিলকে স্তব্ধ করিয়া ফেলিল। সে একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না।

২৭

আচার্য্যের কুটীর আজ উৎসবময়। আনন্দময়ী, সরযূ, অনিল ও রমা তাঁহার গৃহে অতিথি। শচীন, দীপ্তি, তৃপ্তি সকলে মিলিয়া আচার্য্যের চারিদিকে উপবিষ্ট।

আচার্য্য বলিতেছিলেন, "সম্পদের সময় যে জিনিষটা অনেক দূরে বলিয়া বোধ হয়, বিপদের কালে সেই জিনিষটা বড়ই কাছে এসে দাঁড়ায়। যদি তাই না হ'তো বিপদের সময় ভগবান যদি মানুষকে কাছে টেনে না নিতেন, তবে যে মানুষ বুকের জ্বালায় পাগল হ'য়ে যে'তো। বিপদে পড়্লেই মানুষ ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকে—তাঁকে পাবার জন্য অধীর হয়, পাপে ঘৃণা আসে। কাজেই বিপদকে অনাদর কর্‌তে নাই। আর বিপদই বা কা'কে বলি? যে অবস্থায় পড়্লে ভগবানকে কাছে পাওয়া যায়, সে অবস্থাটাকে কে না আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করে? প্রকৃত হিসাবে তাহা তো বিপদের অবস্থা নয় বরং চিরস্থায়ী সম্পদের পথ-প্রদর্শক। আমাদের অল্প বুদ্ধি, ক্ষুদ্র জ্ঞান। কাজেই সামান্য অবস্থান্তরকেই সম্পদ অথবা বিপদ নামে অভিহিত করি। ভগবানকে না পাওয়ার অবস্থাতেই মানুষ এ রকম করে থাকে। ভগবানের অস্তিত্ব যা'রা একবার হৃদয়ে অনুভব কর্‌তে পেরেছে, তা'রা মনে করে সম্পদ ভগবানের অনুগ্রহপ্রসূত—বিপদও ভগবানের দান। সম্পদ বিপদ উভয়কেই তা'রা বরণ ক'রে

রাখে। ভগবানের কোন দানকেই তা'রা তুচ্ছ করে না। আমি যাহাকে সম্পদ অথবা বিপদ মনে করি, আমার পক্ষে তাহা সত্য হ'লেও, সকলের পক্ষে তাহা সত্য না হ'তেও পারে।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "বাবা, তোমার মত যা'রা জ্ঞানের মুকুট মাথায় প'রে সংসারের ক্ষণস্থায়ী অসুবিধাগুলিকে উপেক্ষা কর্‌তে শিখেছে, তা'রাই এ ভাবে "বিপদ" কথাটার অর্থ ক'রে নিতে পারে। আমাদের সে শক্তি নেই। অনিষ্টের একটু ছায়া পাতেই আমরা অধীর হই। যোগেশের সহিত অনিলের যা' কিছু ঘটেছে—তোমাকে সব বলেছি। অনিল ত একেবারে বেঁকে বসেছে—এখানে আর থাক্‌বে না। রমাকেও সঙ্গে নিয়ে যা'বে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা'বে, এ'তে অসাধ কা'র? কিন্তু এ ভাবে যাওয়াটাই বড় দুঃখের কথা।"

শচীন বলিল, "অনিলদের এখান থেকে যাওয়ার কথায় দুঃখটা আমাদেরই বেশী হওয়া দরকার। অনিলের এ নিগ্রহ-ভোগের কারণ যে আমরাই।"

অনিল। তোমাদের কাছে থাক্‌তে পে'লে এ নিগ্রহ আমি হাজার বার মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছি। রমাকে রেখে আবার আমি তোমাদের কাছেই ফির্‌ছি। দুঃখ কর্‌বার ত কিছু নেই শচীন-দা'।"

আচার্য্য আনন্দময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মা, কর্ত্তা হ'য়ে আমরা কোন কাজ কর্‌তে পারি না। তবে আমাদের দুঃখ কর্‌বার কি কারণ থাক্‌তে পারে? কর্ত্তব্যটুকু যদি শেষ হয়, তবেই

ত সুখ দুঃখের হাত ছাড়িয়ে গেলাম। বিধাতার বিধান পূর্ণ হ'বেই মা। তা' রোধ কর্‌বার শক্তি ত তোমার আমাদের নাই।"

রমা একটু সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, "আপনার পায়ের ছায়া ছেড়ে—দিদিমা'র কোল থেকে দূরে সরে যাওয়াটা বড়ই যে প্রাণে লাগ্‌বে ঠাকুর!"

দীপ্তি হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমরা বুঝি তবে তোমার কেউ নই রমা! দিদিমা আর ঠাকুরই বুঝি তোমার সব?"

রমা দীপ্তির কাছে সরিয়া বসিল। বলিল, "কয়েক দিনের পরিচয়েই যে তোমরা আমাদের নিতান্ত আপনার হ'য়ে গেছ দিদি! এমন আপনার বুঝি আমাদের আর কেউ নেই। ঠাকুরের কথার মধ্যেই যে তোমরা সকলে আছ দিদি!"

দীপ্তি রমার হাতখানি ধরিয়া বলিল, "আমরাও তোমাকে চিরদিন আপনার ক'রে রাখ্‌তে চাই রমা! ভগবান যেন তাহাই করেন।"

অর্থটা স্পষ্ট ভাবে না হউক, রমা একপ্রকার বুঝিল। এক ধারে শচীন বসিয়াছিল, রমার দৃষ্টি একবার তাহার উপর পড়িল। অমনি অবনত চক্ষে আনন্দময়ীকে বলিল, "দরজায় একখানা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। ডাক্তারসাহেবের বাড়ীর মেয়েরা এলেন বোধ হয়?"

কথা শেষ না হইতেই লীলার সহিত শ্রীমতী বেলা সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

আচার্য্য কহিলেন, "দরিদ্রের কুটীরখানি আজ গৌরবে ধনীর

প্রাসাদকে পরাজিত করেছে। ঠাকুরের প্রিয় সন্তানগুলির মিলনে এখানে একটা আনন্দের বাজার মিলে গেল যে। এসো, মায়েরা, ওই আসনের একধারেই বসো।"

বেলা বলিলেন, "আপনার ব্যবহারে আমাদের প্রাণে বড়ই বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। হিন্দু-সমাজ আমাদের যেন একটু কেমন কেমন ভাবে দেখে। সামাজিক হিসাবে আমরা তা'দের কাছে একটা ঘৃণার জিনিষ। আপনি এমন নিষ্ঠাবান হিন্দু, কিন্তু আপনার ত সে ভাব নেই।"

আচার্য্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সামাজিক হিসাব একটা ভিন্ন জিনিষ। সামঞ্জস্য রক্ষা কর্‌বার জন্য সে হিসাবটা না কর্‌লে ও চলে না। কিন্তু তা' ব'লে মানুষ মানুষকে ত কোন রকমেই ঘৃণা কর্‌তে পারে না। সকলের প্রাণেই এক ভগবান সাড়া দিচ্ছেন। তাঁ'র কাছে ত সকলেই সমান।"

বেলা। এ উদারতায় যদি সমস্ত জগৎ অনুপ্রাণিত হ'তো, ক্ষুদ্র স্বার্থ অথবা সঙ্কীর্ণতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ না হ'য়ে যদি সকলেই এমন ভাবে দৃষ্টি কর্‌তে জান্‌তো, তবে বুঝি পৃথিবীও স্বর্গে বিশেষ বিভিন্নতা থাক্‌তো না।

আচার্য্য। জগতের মঙ্গল কামনা যাঁ'রা করেন, তাঁরা ত এমনিই উদার। তাঁ'রা যে স্বার্থ অথবা সঙ্কীর্ণতার সীমানার বাইরে। ইশা, মুসা, মহম্মদ, বিষ্ণু, মহাদেব সকলেই তাঁ'দের পূজ্য, ভক্তির পাত্র। লোক শিক্ষার জন্যই ভগবানের অবতার। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকৃতির লোকদিগকে তদুপযুক্ত শিক্ষা

দেওয়ার জন্য ভগবান নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন। মূর্ত্তিভেদে প্রকৃত জিনিষের কোন ব্যতিক্রম হয় না। কাজেই বিশ্বাস পৃথক হইলেও একজন অন্য কাহাকে ঘৃণা করবে, এ অধিকার ত' মানবের নেই।

বেলা। সংসারে এমন উদার ভাব কয়জনের আছে ঠাকুর? আপনি বোধ হয় শুনেছেন, আমরা এখানে আসি যাই বলে সমাজ থেকে আপনাকে নির্য্যাতন করবার প্রস্তাব চল্‌ছে।

আচার্য্য একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "কই, না, তা'তো শুনিনি। এ যে একেবারে অসম্ভব ব'লে মনে হ'চ্ছে মা!"

অনিল। অসম্ভব কিছুই নয় ঠাকুর! এ কথা আমিও শুনেছি। যা'দের মান বাঁচাবার জন্য শচীন-দা' শরীরের রক্ত দিয়েছিল, তা'রাই সব এক জোঁট হ'য়ে এ পরামর্শ আঁটছে। সব শুনে আমার ঘৃণা ধরে গেছে। আপনাকে নাকি এক ঘরে ক'রে রাখা হ'বে।

আচার্য্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা'তেই যদি সকলে খুসী হয়——করুক্ না।"

অনিল। তা'দের পরামর্শ এখানেই শেষ নয়। প্রবল জমীদারের বিরুদ্ধে আর তা'রা চল্‌বে না। সকলে মিলে মামা-বাবুর কাছে যা'বে। আর যা' কিছু হ'য়েছে সব দোষ শচীন-দা' ও আপনার কাঁধে চাপিয়ে দেবে।

আচার্য্য। তা'তেই বা দুঃখ কি অনিল! ভগবান যতদূর শক্তি দিয়েছেন, সইব। না পারলে তাঁ'র ভার তিনিই কাঁধে তুলে নেবেন।

আনন্দময়ী লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। সরযু বলিলেন, "দাদাকে ডেকে আপনি কেন একদিন সব কথা বুঝিয়ে বলুন না, ঠাকুর! আপনার কাছে এলে দাদার মতি নিশ্চয়ই ফিরে যাবে।"

আচার্য্য। জোয়ারের টান ভাটায় ঠিক বদ্‌লাবেই। অধীর হ'য়ে কাজ কি দিদি?

রমা দীপ্তিকে কহিল, "আর তোমাদের এখানে থেকে কাজ নেই দিদি! আমরা যেমন ক'রেই হো'ক বাবাকে বলে তোমাদের জন্ত আমাদের বাড়ীর কাছে একটু জায়গা ক'রে রাখ্‌বো।"

আনন্দময়ী আচার্য্যের হাত দু'খানি ধরিয়া বলিলেন, "একটা কথা তেমোকে রাখ্‌তে হ'বেই বাবা! আমি যোগেশের মা। মায়ের প্রাণের দিকে চেয়ে তোমাকে এ প্রতিজ্ঞা কর্‌তেই হ'বে যে, যোগেশ আমার যাই করুক্ না কেন, তুমি তা'কে মর্ম্মান্তিক অভিশাপ দিতে পার্‌বে না, বরং তা'কে পরিবর্ত্তিত কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে! সে যে বড় অবোধ। বল, তুমি তা'কে সংশোধনের পথটা দেখিয়ে দেবে।"

আচার্য্য কহিলেন, "আগেই ত বলেছি মা, মানুষ কর্ত্তা হ'য়ে কোন কাজ কর্‌তে পারে না। সবই ভগবানের ইচ্ছা। যোগেশ বাবুর প্রতি আমার ত কোন বিদ্বেষ নাই। আপনার কথা কখনই আমি ফেল্‌বো না, ঠিক জান্‌বেন।"

দীপ্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এঁ'রা সকলেই আজ ঠাকুরের প্রসাদ পাবেন। যাও মা, তুমি আয়োজন ক'রে দেও।"

বেলা কহিলেন, "আমরাও প্রসাদ পাবার জন্য অপেক্ষা কর্‌বো ঠাকুর ?"

আচার্য্য। কেন কর্‌বে না মা।

বেলা। আপনি যে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ।

আচার্য্য। ব্রাহ্মণ জাতিটা ত কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। গুণের বিকাশেই ব্রাহ্মণত্ব। সে হিসাবে অনেকেই যে ব্রাহ্মণ হ'তে পারে মা।

বেলা। এখানকার জাতি-বিভাগটা ত ঠিক্ সে রকমের নয়।

আচার্য্য। অভ্যাস ও অন্ধ বিশ্বাসে এই রকম ক'রে রেখেছে মা! জাতি বল্‌লে বুঝ্‌তে হ'বে, একই গুণবিশিষ্ট কতকগুলি লোকের সমষ্টি। বহুদিন পূর্ব্ব থেকে সেই লোকগুলি এক একটা জাতিতে গঠিত হ'য়ে আছে। অভ্যাস-ক্রমে তা'দের সন্তান সন্ততিগণও সেই জাতির অন্তর্গত বলে পরিচিত হ'য়ে যাচ্ছে। যে সমস্ত গুণের অধিকারী হওয়ায় মানুষ যে কোন একটা জাতিতে পরিণত-হয়, যদি মানুষের মধ্যে সেই সমস্ত গুণের একান্ত অভাব হ'য়ে পড়ে, তবে ত আর মানুষ সে জাতিত্বের দাবী রাখ্‌তে পারে না।

বেলা। তবে গুণের বিকাশে নিকৃষ্ট জাতিও উৎকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হ'তে পারে ?

আচার্য্য। কেন পার্‌বে না মা! ব্রাহ্মণের ছেলে হ'লেই যে, সে ব্রাহ্মণ থাক্‌বে তার ত কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে ব্রাহ্মণ থাকাটা তার পক্ষে খুবই সহজ। আর ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির

মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণের বিকাশ হ'লে, সে জাতি ত ব্রাহ্মণ জাতি থেকে হীন বলে বিবেচিত হ'তে পারে না। গুণের সম্মান কে না ক'রে থাকতে পারে মা?

বেলা। এ ভাবে ত জাতির বিচার কেউ করে না, ঠাকুর!

আচার্য্য। এক দিকের অভিমান ও অপর দিকের অক্ষমতা ও অন্ধ বিশ্বাস এ ভাবে জাতির বিচার করতে দেয় না। কেবল সন্ধ্যা বন্দনা বা আচার নিষ্ঠার মধ্যেই ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ নয় মা! তবে এইগুলি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবার বা ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখবার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। অনুষ্ঠিত কার্য্যের মধ্যেই গুণের বিকাশ। আর সে কর্ম্মের হিসাবেই জাতি নির্ণীত হয়।

বেলা। তবে ত যে কোন জাতির লোক ব্রাহ্মণ হতে পারে?

আচার্য্য। গুণযুক্ত হলে যে কোন লোক ব্রাহ্মণে পরিণত হ'তে পারে, আর গুণের অভাবে ব্রাহ্মণ সন্তানও যে কোন নিকৃষ্ট জাতিতে পরিবর্ত্তিত হয়।

বেলা ভক্তিভরে আচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আপনার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার শক্তিও যে আমার নেই ঠাকুর।"

আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "কুণ্ঠিতা হচ্ছ কেন মা! তোমাদের অনুষ্ঠিত সকল কাজেই যে ব্রাহ্মণোচিত গুণের বিকাশ পাচ্ছে। তোমরা ত কোন অংশেই আমার অপেক্ষা হীন নও।"

২৮

কয়েকটি ফুটন্ত গোলাপ হাতে লইয়া গোলাপফুলেরই মত লীলা মিঃ মুখার্জ্জির বসিবার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দাদা আর বউদিদি গল্প করিতেছেন।

মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন, "নন্দনপুরের বাতাসটা বড়ই অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। স্বার্থ যেখানে এত প্রবল, গর্ব্ব যেখানে শাসন করে, প্রবৃত্তি যেখানে চালক, সে জায়গায় বাস করা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। কোন্ দিন কোন্ বিপদ এসে দুয়ারের সাম্‌নে দাঁড়াবে, তা'র ঠিক নেই। মনে হচ্ছে অন্য কোথাও দিন কত থেকে আসি। ভেবেছিলাম শান্তভাবে পল্লীর সুকুমার ক্রোড়েই জীবনটা কাটিয়ে দিতে পার্‌বো, তা' হয়ে উঠ্‌লো না দেখ্‌ছি। কোথায় যাওয়া যায় বল দেখি লীলা!"

লীলা। যোগেশবাবুকে বাইরে থেকে ত বেশ ভাল লোক ব'লেই মনে হয়। তবে তিনি কেন এত উৎপাত বাড়িয়ে তুল্‌ছেন? যদি কেউ তাঁর ভুলটা বুঝিয়ে দেয়, তবে বুঝি সব জঞ্জাল মিটে যায়!

বেলা। আমারও ধারণা তাই। অনিলও আমাকে এই কথাই বল্‌ছিল। অনিলটি বড় ভাল ছেলে—কি বলিস্ লীলা?

লীলা কোন কথা না বলিয়া টেবিলের উপর ফুলগুলি সাজাইতে লাগিল।

বেলা পুনর্ব্বার বলিলেন, "বরেন ছেলেটিও বড় সৎ। বাপের কথা উঠ্‌লেই তা'র মুখখানা এতটুকু হ'য়ে যায়। এত বড় হ'য়েছে, মুখ তুলে বাপের সঙ্গে কথা কয় না। ছেলেটিকে কিন্তু বাপ নিতান্ত বোকা মনে ক'রে রেখেছে। ছেলের বুদ্ধিটুকু যদি বাপের থাকৃতো, তবে এ নন্দনপুর নন্দন-কাননে পরিণত হ'তো।"

মিঃ মুখার্জ্জি। বরেন বড় লাজুক। যা' বল্‌তে চায়, সঙ্কোচে তা' মুখ ফুটে বলে না। নন্দনপুরের অবস্থা এমনি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে, যদি বরেনের মুখে কথা ফুট্‌তো তবে এর প্রতিকার সহজ হ'য়ে যে'তো। একদিন কিন্তু এ নীরব কামান গর্জ্জে উঠবে, তা' আমি বলে রাখ্‌ছি।

অনিল ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। মিঃ মুখার্জ্জি হাত ধরিয়া অনিলকে একখানি আসনে বসাইয়া দিলেন।

বেলা। সুপ্রভাত অনিলবাবু! এতক্ষণ আমরা তোমাদের কথাই বল্‌ছিলাম। রোজ আমরা তিন জনে চা পান করি। আজ তোমাকে অতিথি পাওয়া গেছে। বেশ হবে, না লীলা?

লীলা। আমি তবে তাড়াতাড়ি চা দিতে বলে আসি।

বেলা। তুই একেবারে নিয়ে আসিস্‌। চা'য়ের সঙ্গে একটু কিছু মুখে দেওয়ারও যেন থাকে।

অনিল। বড়ই একটা দুঃসংবাদ বহন করে আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আচার্য্যঠাকুরকে নির্য্যাতন কর্‌বার জন্য গ্রামের সমস্ত লোক উঠে পড়ে লেগেছে। কেউ তাঁর বাড়ীতে খাবে না,

তাঁ'কেও আর কেউ খাওয়াবে না। ধোপা, নাপিত, পুরোহিত সব তাঁ'কে পরিত্যাগ করেছে। এমন কি সকলে যে পুকুরের জল পান করে, তিনি সে পুকুরের জলটুকু পর্য্যন্ত স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বেন না। এই ত গেল বাইরের অবস্থা। ভিতরে বোধ হয় এর চেয়ে আরও বেশী কিছু আছে ব'লে মনে হয়। কি করা যায় বলুন ত?

বেলা। ঠাকুরের অপরাধটা কি?

অনিল। আপনাদের কাছে সব কথা খুলে বল্‌বো ব'লেই এসেছি। লজ্জার এ সময় নয়। ঠাকুরের বাড়ীতে আপনাদের যাতায়াতেই এ অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। সকলেই বল্‌ছে, আপনাদের সঙ্গে তিনি খাওয়া দাওয়া করেন।

বেলা। আমাদের উপর প্রথমে এ সব বিধান না হ'য়ে ঠাকুরের উপর গড়িয়ে দেওয়া হ'ল কেন?

অনিল। সে কথা ত আমি জানি না।

বেলা। সমাজকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে হয় না?

অনিল। কে জিজ্ঞাসা কর্‌বে?

বেলা। কেন, তুমি?

অনিল। আমার কথা সমাজ শুন্‌বে কেন? আমি যে ঠাকুরের পক্ষ।

বেলা। হলেই বা। ন্যায় সঙ্গত কথা শুন্‌তে সমাজ বাধ্য।

অনিল। হাজার বার ন্যায় সঙ্গত হ'লেও বিরুদ্ধ পক্ষের কথায় সমাজ কান দিবে না।

বেলা। তবে বিচার কর্‌বে কেমন ক'রে?

অনিল। এসব না হ'লেও সমাজ বিচার ক'র্‌তে জানে।

বেলা। ফলে তা' অবিচারই হয়ে যায়।

অনিল। সমাজ যা' করে বা বলে তাকে যে অবিচার বল্‌বে, সে সমাজে তা'র ঠাঁই হ'বে না।

মিঃ মুখার্জ্জি। আমাদের দেশে লোকে পাথরের ঠাকুর পূজো করে। রক্তমাংসের শরীর হলেও এ আচার্য্যঠাকুরটি পাথরের ঠাকুরের মতই। এঁর অনিষ্ট করতে পারে, এমন শক্তি কোন সমাজেরই নেই। তোমরা এত ভীত হচ্ছ কেন?

বেলা। আমাদের সংস্রব ছেড়ে দিলেই ত ঠাকুরের অপরাধ কেটে যায়। তিনি কেন তাহাই করুন্ না।

মিঃ মুখার্জ্জি। তুমি এখনও ঠাকুরকে চিন্‌তে পার নাই। আত্মপক্ষ সমর্থন অথবা আরোপিত অপরাধ স্খালনের চেষ্টা, কোনটাই ঠাকুর কর্‌বেন না। আকাশের মত উদার প্রাণে কি ক্ষুদ্রত্বের স্থান আছে?

বেলা। তবে কি তিনি এ স্বেচ্ছাচারের নির্য্যাতন সহ্য করেই যাবেন?

মিঃ মুখার্জ্জি। তুমি যাকে নির্য্যাতন বল্‌ছো, ঠাকুর তাকে কি মনে করেন জান? তিনি এ রকম ক'রে ভাব্‌তেই জানেন না। এ সব ছেড়ে আমরা নয় দিনকত হুগলীতে যাই চল। এখানে আমরা না থাক্‌লে এ কথাটা চাপাও প'ড়ে যেতে পারে।

অনিল। না—না, তা যাবেন না। এ অবস্থায় ঠাকুরদের

ফেলে যাওয়াটা তেমন ভাল হবে না। কাছে থেকে একটা উপায় করুন।

মিঃ মুখার্জ্জি। ঠাকুরকে এ বিষয়ে কিছু করতে বলা আর তাঁকে অপমান করা একই কথা। সাধারণ লোক সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা স্পৃহনীয়, ঠাকুর যে তার অনেক উপরে। যে ভাবে তিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছেন, মানুষ তাঁর ভাল বা মন্দ কিছুই করতে পারে না।

চা লইয়া লীলা আসিল।

মিঃ মুখার্জ্জি। কথায় কথায় অনেক বেলা ক'রে ফেলেছি অনিল, একটি রোগী এতক্ষণ আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে। তাড়াতাড়ি চাটুকু পান ক'রে আমাকে এখনি বেরুতে হচ্ছে। তোমরা ততক্ষণ বসে গল্প কর।

মিঃ মুখার্জ্জি লীলার হস্ত হইতে এক পেয়ালা চা লইয়া পান করিলেন এবং অনিলকে বলিলেন, "এখন তবে আসি। তোমাকে দেখলে আমার ভারি আনন্দ হয়। যেখানেই থাক, আমাদের দেখা নিশ্চয়ই হ'বে।"

মিঃ মুখার্জ্জি প্রস্থান করিলেন।

বেলা কহিলেন, "এর আগে মিঃ হীরালালকে নিয়ে সমাজের লোকেরা কি একটা গোলমাল ক'রেছিল না অনিলবাবু?"

অনিল। যে সমাজের পক্ষে দাঁড়িয়ে শচীন-দা অশেষ অত্যাচার সহ্য ক'রেছিলেন, সেই সমাজই এখন ঠাকুরের বিরুদ্ধে

দাঁড়িয়েছে। পুতুলনাচের পুতুলগুলি যেমন চালকের হস্ত চালনায় নেচে বেড়ায়, এ সমাজ ঠিক তাই। মানুষগুলো যেন সব প্রাণহীন। আপনারাও শুনছি চ'লে যাবেন। আমরা ভাই বোনও আর এখানে থাক্‌তে পাচ্ছি না। কি যে হ'বে, ভগবানই জানেন।

বেলা। মানুষ যখন যে সমস্যার মীমাংসা কর্‌তে না পারে, তখন সে ভারটা ভগবানের উপর চাপিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়। তা' ছাড়া ত উপায় নাই!

লীলা। হুগলীতে আমাদের তিনখানা বাড়ী আছে। এক খানা বাড়ী ঠাকুরদের ছেড়ে দিলে, তাঁ'রা সেখানে বেশ থাক্‌তে পারেন। দাদা এলে এ কথাটা তাঁকে বল্‌বে বউদিদি?

বেলা। ঠাকুর কি যাবেন?

লীলা। আমরা খুব বেশী ক'রে বল্‌বো। অনিলবাবুও চেষ্টা ক'রে দেখুন।

অনিল। কোন্ পথটা ধর্‌লে যে এ বিপদের হাত এড়ান যাবে, তা ঠিক্ কর্‌তে পাচ্ছি না। ঠাকুর ত বিপদকে বিপদ ব'লেই মনে করেন না। শচীন-দাও এ সব কিছু গ্রাহ্য কর্‌তে চান না। দিদিমার কাছে এ সব কথা তুল্লে তিনি কেঁদেই আকুল হন। মামাবাবুকে এবিষয়ে কোন কিছু বলা আমার সাধ্যের অতীত। উপায়ের মধ্যে একটা দেখ্‌তে পাচ্ছি, ভগবানের কাছে নীরবে প্রার্থনা করা। এখন থেকে কেবল তাই কর্‌বো বউদি।

বেলা। এমন নিরাপদ উপায় আর তো কিছুই নেই।

লীলা। আজ বাগান থেকে অনেকগুলি ফুল তুলে এনেছি। গোটাকতক ঠাকুরকে পাঠিয়ে দিলে হয় না বউদি ?

বেলা। লীলার গাছের ফুলগুলি খুব ত বড় হ'য়েছে। দে ত লীলা, একটা অনিলবাবুকে।

লীলা নীরবে একটি গোলাপফুল অনিলের হস্তে তুলিয়া দিল।

অন্যমনস্কভাবে ফুলটি নাড়িতে নাড়িতে অনিল কহিল, "এখন তবে বিদায় বউদি, যাবার আগে আর একবার দেখা ক'রে যাবো।"

বেলা। রমাকে সঙ্গে আন্‌তে ভুলো না যেন।

অনিল গৃহের বাহিরে গেল। একটু দূরে গিয়া ফুলটি বুকের উপর পরিল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, লীলা তাহার দিকেই চাহিয়া আছে।

অনিল দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

২৭

ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভাবনাগুলি একত্র হইয়া যেন আজ রমার মাথার মধ্যে আসিয়া জুটিল। যোগেশবাবুর বিসদৃশ ব্যবহার, আনন্দময়ী ও সরযূর অকৃত্রিম স্নেহ, আচার্য্যের দেব-ভাব—রমার কাছে যেন একটা নূতন ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিল।

আর একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাব তাহার প্রাণে জাগাইয়া দিল শচীন। আরাধনার দেবতাকে যেমন মানুষ তাহার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে লুকাইয়া রাখে, রমাও তেমনি শচীনের মূর্ত্তিখানি হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিল।

প্রথম যে দিন উৎপীড়িত শচীন আনন্দময়ীর ক্রোড়ে চেতনা-হীন অবস্থায় রমার চক্ষে পড়িয়াছিল, সেই দিন হইতেই রমা শচীনের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিয়াছে। সেইদিন হইতেই শচীনের অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্য্য—রমার চক্ষে মহিমামণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এত সাহস, এত তেজ—এমন করুণা, এমন আত্মত্যাগের ছবি—রমার চক্ষে ত আর কেহ তুলিয়া দেয় নাই। রমা নির্ব্বাক বিস্ময়ে প্রাণের মন্দিরে শচীনকে দেবতার আসন প্রদান করিয়া ফেলিল। যোগেশবাবুর ব্যবহারে নন্দনপুরের উপর রমার বিদ্বেষের কারণ যথেষ্ট থাকিলেও, আর এক দিকের আকর্ষণটাও রমার কাছে বড় কম মনে হইত না।

নন্দনপুরে অবস্থান করা আর চলে না। অনিল সে কথা

স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া রাখিয়াছে। রমাও বুঝিয়াছে এখানে থাকিলে অনিলের বিপদ অনিবার্য্য। আজ হউক আর দুইদিন পরেই হউক, নন্দনপুর ত্যাগ করিতেই হইবে।

রমা নির্জ্জনে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে এই সমস্ত কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময় অনিল আসিয়া বলিল, "বড়ই বিপদ রমা! বাবা চিঠি দিয়েছেন; তিনি একটা মিছে মোকদ্দমায় জড়িয়ে প'ড়েছেন। হুগলীতে মোকদ্দমার বিচার হবে। তোকে বাড়ীতে রেখে আমায় তিনি হুগলীতে যেতে লিখেছেন। আর তো দেরী কর্‌বার সময় নেই রমা! আজই যেতে হবে। চিঠি পেয়েই আমি শচীন-দা'র কাছে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে সে হুগলী যেতে স্বীকার হ'য়েছে। তুই তৈরী হ'য়ে থাক। দিদিমাকে এ সব ব'লে ভাবিয়ে তোল্‌বার দরকার নেই। আগে থেকেই ত আমাদের যাবার কথা একরকম ঠিক ছিল। আমরা তেম্‌নি ভাবেই যাব।"

কথাগুলি সমস্ত এক নিঃশ্বাসেই অনিল বলিয়া গেল।

রমা ব্যস্তভাবে বলিল, "কি মোকদ্দমা দাদা, বাবা কি লিখেছেন?"

অনিল। মোকদ্দমা বড় সঙ্গীন। মহালে একটা খুন হ'য়েছিল।

রমা কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "কি হবে দাদা?"

অনিল। কাঁদিস্ কেন রমা? বাবার ত কোন অপরাধ নাই। বিপদ ঠিকই কেটে যাবে। বাবা কি লিখেছে জানিস্? শোন্—

"বাবা অনিল, যে আঘাত আমি তোদের প্রাণে দিয়েছি— দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত তোরা সারা জীবনেও তা ভুল্‌তে পারবি ব'লে মনে হয় না। কিন্তু তোদের আঘাতের নীরব প্রতিঘাতে আমার প্রাণে যে কি বেদনার জ্বালা অহর্নিশি জাগ্রত আছে, তা' আমি ত তোদের বোঝাতে পার্‌বো না। পিতা আমি— সন্তানের কাছে কি ব'লে যে গত ঘটনার জন্ম অনুতাপ ক'র্‌বো, তা' তো খুঁজে পাচ্ছি না। আজ তোকে প্রাণের সঙ্গে কাছে আন্‌বার জন্ম ডাক্‌ছি। রমাকে বাড়ী রেখে, যত শীঘ্র সম্ভব তুই এখানে আয়——"

রমা। থাক্ দাদা! আর শু'নে কাজ নেই। এত স্নেহ যাঁর হৃদয়ে, তাঁর আহ্বান উপেক্ষা ক'র্‌তে নেই। আমি এখনি সব ঠিক ক'রে ফেল্‌ছি।

আনন্দময়ী সেখানে আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "কিরে অনিল, দুই ভাইয়ে বোনে লুকিয়ে কি পরামর্শ হচ্ছে?"

রমা। লুকিয়ে কেন দিদিমা, বাবা আমাদের যাবার জন্ম চিঠি লিখেছেন। দাদা সে চিঠিখানা দেখাচ্ছিল।

আনন্দময়ী। কেন লিখ্‌বে না দিদি? বাপ্ কি কখনো পর হ'তে পারে? সে ভাল আছে ত?

অনিল। ভালই আছেন দিদিমা। আমরা আজই রওনা হবো।

আনন্দময়ী অতি করুণ ভাবে একবার অনিলের আর একবার রমার প্রতি চাহিতে লাগিলেন। আনন্দময়ীর প্রাণের একটা

রুদ্ধ বেদনা যেন প্রকাশ হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। যেমন আদরের সহিত যোগেশবাবু দুইটী. ভাই ভগিনীকে লইয়া আসিয়াছিলেন, আজ বিদায়ের দিনে ত যোগেশবাবুর প্রাণে সে আদর নাই। অনিল, রমা ত যোগেশবাবুর ফেলিয়া দেওয়ার সামগ্রী নয়। কতকগুলি ঘটনার স্রোত অবস্থাটাকে এমনি জটিল করিয়া তুলিয়াছে যে, অনিল ও রমার প্রতি যোগেশবাবুর স্নেহ-ভাণ্ডারের দুয়ার রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এ চিন্তাটাই আনন্দময়ীর প্রাণে বেশী লাগিল।

সরযূ আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেই আনন্দময়ী কহিলেন,—"আজই রমাকে নিয়ে অনিল বাড়ী রওনা হবে। কিছু খাবার তৈরী করিয়ে দে মা!"

সরযূ রমার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী মা-টি আমার, বাড়ী গিয়ে আমাদের কথা ভুলে যাবি না ত? আবার কবে তোদের সঙ্গে দেখা হবে, তা' ভগবানই জানেন। আমার কাশীর বাড়ী শেষ হ'য়ে গেছে। মাকে নিয়ে চার পাঁচ দিনের মধ্যে আমিও কাশী চলে যাচ্ছি। দেখি বিশ্বেশ্বরের পায়ের তলায় প্রাণের বোঝাটা নামিয়ে দেওয়া যায় কি না।"

অনিল। আমরা ত সকলেই নন্দনপুর ছেড়ে চলেছি। রইলেন শুধু ঠাকুর। ভগবান করুন তাঁ'র যেন কোন বিপদ না হয়।

সরযূ। ঠাকুরের ভাবনা আমাদের ভাব্‌তে হবে না অনিল! বরং তিনিই নিয়ত দেবতার চরণে আমাদের মঙ্গলকামনা কচ্ছেন।

আর সেই প্রার্থনাতেই আমাদের সকল বিপদ কেটে যাবে। কাশীতে গিয়ে আমি ঠাকুরকেও সেখানে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবো। তোদেরও কিন্তু আমি চাই। আয়, তোরা কিছু মুখে দিবি আয়।

সকলেই বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

৩০

প্রলোভনের সামগ্রী লইয়া খেলা করা আর বিপদকে ডাকিয়া আনা একই কথা। প্রশ্রয়ে প্রবৃত্তি উত্তেজিত, আর শাসনে দমিত হয় এ কথাটা যে ভাল করিয়া না বোঝে তাহার পরিণাম ঠিক হেমলতার মতই হইয়া পড়ে।

হেমলতা যে নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়াছিলেন, তাহার গতি স্রোতের বিপরীত দিকে ফিরাইবার শক্তি তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। অথচ অনুকূল স্রোতের দিকেও জোর করিয়া নৌকা চালাইতে পারিতেছেন না।

হেমলতার জীবনে এ বড় সঙ্কট সময়। মাষ্টারের চিন্তায় তাঁহার সুখ, ভাবনায় আনন্দ। কিন্তু মুখ ফুটিয়া ত তিনি কিছু বলিতে পারেন না। এইটুকু শুধু নারীত্বের অভিমান; এ অভিমান তিনি এখন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

একই ভাবনাকে শতবার ভাঙ্গিয়া—শত ছাঁচে ঢালিয়া একটা কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিতে খাড়া করিয়া তুলিবার চেষ্টা দিনের মধ্যে সহস্রবার বিফল হইয়া যায়, তবুও হেমলতা সে ভাবনা ত্যাগ করিতে পারেন না। কোন দিনই হেমলতার প্রাণের দৃঢ়তা ছিল না। প্রৌঢ় বিজয়বাবুর সহিত বিবাহে হেমলতার প্রবৃত্তিগুলি আরও শিথিল-বন্ধন হইয়া পড়িয়াছিল। অপরাধ

সমস্তই বিজয়বাবুর। স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে যে দোষ গুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, বিজয়বাবু ও হেমলতার মিলনেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

প্রৌঢ় বিজয়বাবু হেমলতার চিত্ত বিনোদনের জন্য যে কৃত্রিম উপায়গুলিকে স্বাভাবিক বলিয়া দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সে গুলিই হেমলতার চরিত্র-গঠন পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিজয়বাবু বিবাহের পর হইতেই হেমলতার দোষ দেখিলে সংশোধনের চেষ্টা করিতেন না বরং অত্যধিক আদর দেখাইতে গিয়া সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও ভুলিয়া যাইতেন। অনিল ও রমার প্রতি হেমলতার বিদ্বেষের তেমন একটা কারণ ছিল না। মাত্র তাহাদের উপস্থিতিতে হেমলতা স্বাধীন ভাবে তাঁহার বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। সকল সময়ে ইচ্ছা হইলেও তিনি বিজয়বাবুকে বিলাসের সহচর রূপে পাইতেন না। কেবল এই কারণেই অনিল, রমা ও তাহাদের ছোট ভগিনীটি তাঁহার বিষ নজরে পড়িয়াছিল। একটু চেষ্টা করিলেই বিজয়বাবু হেমলতার প্রবৃত্তিগুলির গতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতেন। তিনি তাহা করেন নাই। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থায় পড়িয়া হেমলতা চিত্ত স্থির রাখিতে পারিতেছেন না। মাথার উপর অন্য কেহ না থাকায় হেমলতাকে কোন দিনই কোন বিষয়ে সাবধান হইতে হয় নাই, সুতরাং তাঁহার নিরঙ্কুশ জীবন-স্রোত উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই চলিতেছিল।

অনিল ও রমার প্রস্থানে, বিজয়বাবুর অনুপস্থিতিতে হেমলতার

হৃদয়টা বায়ু-তাড়িত তরঙ্গ-বহুল নদীবক্ষের ন্যায় উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল।

মাষ্টারের হৃদয়ের পরিচয় হেমলতা এখন স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ও যে হেমলতার অনুরূপ ভাবে পূর্ণ এ বিষয়ে হেমলতার এখন আর সন্দেহ মাত্রও নাই। কিন্তু উভয়েই এখন পর্য্যন্ত অনুভবের উপর নির্ভর করিয়াই চলিতেছেন। প্রকাশ্যে ভাবের আদান প্রদান হয় নাই।

মাষ্টার বিজয়বাবুর বন্ধু পুত্র। বিজয়বাবু মধ্যে মধ্যে যে পত্র লেখেন—প্রতি পত্রেই মাষ্টারকে বাড়ীর তত্ত্বাবধান করিতে অনুরোধ করেন। মাষ্টারকে আত্মীয় মনে করিবার জন্য তিনি হেমলতাকে জেদ্ করেন।

মাষ্টারকে লইয়া হেমলতা বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। এতকাল পরিচয়ের পর এখন লজ্জা বা সঙ্কোচের অভিনয় করাটা তাঁহার বড়ই বিসদৃশ মনে হইতে লাগিল। কাজেই প্রাণের মধ্যে যে ভাবই থাকুক না কেন, বহু চেষ্টায় হেমলতা পূর্ব্বভাব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এ ঘনিষ্ঠতাও কিন্তু হেমলতার বিপদ বাড়াইয়া দিল।

৩১

সংসারে যাহারা একেবারে অনাসক্ত—শোক দুঃখ, হর্ষ বিষাদ যাহারা সমান ভাবে গ্রহণ করিতে জানে—সম্পদে বিপদে যাহাদের চিত্ত বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না—বাহ্য ভোগবিলাস কেবল তাহাদেরই প্রাণের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু যে হৃদয়মধ্যে নিত্য নূতন বাসনার বীজ অঙ্কুরিত হয়, শিক্ষা ও সংযমবিহীন যে হৃদয়মধ্যে কামনা-বৃক্ষ নিত্য নূতন পুষ্প ফল প্রসব করে—সে হৃদয়ের উপর বাহ্য সৌন্দর্য্য ও বাহ্য লালসার প্রভুত্ব দুর্দ্দমনীয়।

হেমলতার হৃদয় প্রকৃত শিক্ষায় অথবা সংযমে গঠিত হয় নাই। কাজেই তিনি বাহ্যবস্তুর প্রবল আকর্ষণ হইতে কিছুতেই প্রাণটাকে টানিয়া রাখিতে পারিতেছেন না।

তবে অন্যায়ের উপর ন্যায়ের প্রভুত্ব স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিক শক্তিই এতদিন হেমলতাকে বাহুবেষ্টনে প্রকাশ্য অন্যায়ের পথে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। সেই শক্তিবলেই হেমলতা এখন পর্য্যন্ত সহস্র প্রলোভন সত্ত্বেও মাষ্টারের নিকট আত্মহৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

বিমলের অনুপস্থিতিতে হেমলতা একদিন মাষ্টারকে পরিবেশন করিতেছিলেন।

মাষ্টার কহিলেন, "তোমাদের এখানে এসে আমি এত

বেশী আদর যত্ন পাচ্ছি, যে সে কথা জীবনে বিস্মৃত হ'তে পারবো না।"

হেমলতা। আপনার জন্ম আমরা এমনিই বা কি করেছি, যা'তে এ ভাব আপনার প্রাণে আসতে পারে?

মাষ্টার। এর চেয়ে বেশী আর মানুষে কি করতে পারে? আমার অসুখের সময় তোমার স্নেহ-যত্ন মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের ন্যায় মৃত্যুর মুখ থেকে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। সে কথা ত আমি ভুলি নাই!

হেমলতা একটু সঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন, "আমাকে এত বেশী বড় ক'রে তোলবার কোন কারণই ত নেই। আপনি অতিরিক্ত কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন।

মাষ্টার। অতিরিক্ত কিছুই না। যা' আমি বলছি—একটা কথাও সাজানো নয়, সব আমার হৃদয়ের কথা।

মাষ্টার স্থিরদৃষ্টিতে হেমলতার মুখের প্রতি চাহিলেন। হেমলতার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, যেন একটা প্রবল ভূ-কম্পনে সমস্ত পৃথিবীটা টলমল করিয়া উঠিল। একটু স্থির হইয়া হেমলতা কহিলেন, "আমি একবার বাইরে থেকে আসি। আপনি ততক্ষণ খেয়ে নিন।"

মাষ্টার। তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার ত আমার কোন অধিকার নাই!

হেমলতার কম্পিত চরণ অগ্রসর হইতে পারিল না। মাষ্টারের দৃষ্টিশক্তি যেন হেমলতাকে অবশ করিয়া ফেলিল।

মাষ্টার বলিতে লাগিলেন, "সেই ছেলেবেলার দেখাশোনার পর কতগুলি বৎসর অতিবাহিত হ'য়ে গেছে, হৃদয়ের কত পরিবর্ত্তন হ'য়ে পড়েছে। সেই একটুখানি ফুটফুটে বালিকাটি তুমি, আজ যে কি নূতন প্রভায় আমার দৃষ্টি-পথের সব জিনিষগুলোকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছো! সে প্রভাটুকু যে আমার কত আদরের তা' তো কাউকে বোঝাবার যো নেই হেম! যদি এমন দিন কখনও পাই, যদি এমন অবসর ভাগ্যক্রমে কখনও জোটে, তবেই সব কথা তোমাকে বোঝাতে পারবো।"

মাষ্টারের কাতরতামাখা সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া হেমলতার প্রাণটাও যেন কেমন হইয়া উঠিল। হেমলতা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এই ত উচ্চ পর্ব্বতের শেষ সীমা, আর একপদ অগ্রসর হইলেই সম্মুখে অতল গহ্বর—সে গহ্বরে কি আছে কে জানে? হয় ত সহস্র বিষধর ফণা বিস্তার করিয়া সে গহ্বরে অপেক্ষা করিতেছে। কাছে পাইলেই বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তাঁহার সমস্ত শরীর জর্জ্জরিত করিয়া দিবে। আর সুখ—সেখানে বুঝি নিশ্চয়ই তাহা নাই।

হেমলতা হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া একটু কঠিন হইয়া দাঁড়াইলেন। নিজের অবস্থাটা একবার ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিলেন। মনে মনে প্রার্থনা করিলেন—এ পরীক্ষা থেকে আমাকে মুক্ত কর ভগবান! নারী হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দূর ক'রে, আমাকে এ পতনের মুখ থেকে তুলে ধর প্রভো! এ

প্রলোভনের মায়া-পাশ ছিন্ন করবার শক্তি তুমি না যুগিয়ে দিলে আর কার কাছে চাইবো দেবতা!

হেমলতা প্রকাশ্যে কহিলেন, "আর আমি এখানে দাঁড়াতে পাচ্ছি না, আমাকে মাপ করবেন।"

অধীর ভাবে মাষ্টার কহিলেন, "আর একটু দাঁড়াও হেম! সেই ছেলে বেলার দোহাই দিয়ে—"

হেমলতা কহিলেন, "ছেলে বেলার কথা আর তুলবেন না, নরেশবাবু! আমি ত আজ আর সে হেমলতা নাই।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া হেমলতা উন্মাদিনীর ন্যায় সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

৩২

কল্পনায় যাহা সহজ বলিয়া মনে হয়, ঘটনায় তাহা তেমন থাকে না। হেমলতা এ কথাটা এখন বেশ বুঝিতে পারিলেন। মাষ্টার সম্বন্ধে যে ধারণা তিনি হৃদয়মধ্যে পোষণ করিতেছিলেন, উপযুক্ত অবসরেও তিনি সে ধারণানুযায়ী কাজ করিতে পারিলেন না। নারীত্বের অভিমান—নারীত্বের মর্য্যাদা তাঁহার প্রাণের মধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দিল। তিনি সে স্থান হইতে ছুটিয়া পলাইলেন। কিন্তু মন ত তাঁহার একেবারে স্থির হইল না। ক্ষুদ্র পতঙ্গ যেমন বহ্নির চতুস্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাঁহার প্রাণটাও তদ্রূপ এ প্রলোভনের অগ্নি-শিখার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। হেমলতার কেবলই মনে হইতে লাগিল—এ অন্ধকূপ হইতে তাঁহাকে টানিয়া তোলে এমন কি কেহই নাই? একটা আশ্রয়ের জন্য তাঁহার সমস্ত প্রাণখানি বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া বিমল বলিল, "পিসিমা, রমাকে সঙ্গে ক'রে অনিলবাবু এসেছেন।"

চমকিত ভাবে হেমলতা কহিলেন, "সত্যি বল্‌ছিস্ বিমল?"

হেমলতার রকম দেখিয়া বিমল একটু বিস্মিত হইল। বলিল, "তুমি দেখ্‌বে চল না।"

হেমলতা বলিলেন, "তুই এগিয়ে যা। আমি এখনি যাচ্ছি।"

বিমল প্রস্থান করিলে হেমলতা যুক্তকরে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া

বলিয়া উঠিলেন, "এই ত ভগবান আমার উদ্ধারের উপায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অসীম দয়ার উপর নির্ভর করতে পারলে বিপদ কি কা'রো কাছে আসতে পারে!"

হেমলতা ভক্তিভরে ভগবানের উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করিলেন।

অনিল ও রমা গৃহে প্রবেশ করিয়াই হেমলতার পদধূলি গ্রহণ করিল।

অনিল বলিল, "তোমার অপরাধী ছেলে মেয়ে আবার তোমার কাছে ফিরে এলো মা!"

রমা হেমলতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিল, "বল মা, আমাদের সব অপরাধ তুমি মার্জ্জনা করলে। এখান থেকে গিয়ে ত আমরা শান্তিতে ছিলাম না। তোমার প্রাণে ব্যথা দিয়ে গিয়েছিলাম, সে পাপের শাস্তি যা' খুসী তুমি দেও মা। আমরা নীরবে সহ্য করবো।"

অনিল বলিল, "না বুঝে যা' বলেছি, যা' করেছি তা'র জন্য পায়ে ধরে ক্ষমা চাচ্ছি মা! একবার আমাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখ, তবেই বুঝবে আমরা তোমার স্নেহের ভিখারী কি না?"

হেমলতা খুব শক্ত করিয়াই রমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর বুকের একটা বড় বোঝা যেন নামিয়া গেল। স্নেহের যে সূক্ষ্ম রেখাটুকু তাঁহার অন্তরে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজিত ছিল, রমার স্পর্শে, অনিলের কথায় তাহা যেন

পরিপূর্ণ অবয়ব ধারণ করিল। তিনি ভাবিলেন, এই ত আমার আত্মরক্ষার অভেদ্য দুর্গ। এ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সকল শত্রুর আক্রমণের পথ যে রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

ক্ষুধিত শিশু যেমন আহার্য্য দ্রব্য পাইলে আনন্দে বিভোর হয়, হেমলতার বুভুক্ষিত হৃদয়ও সন্তান-স্নেহের প্রথম আস্বাদনে তেমনি উল্লসিত হইয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন, "মঙ্গলময়ী ঊষার ন্যায় তুই আজ এ গৃহের অন্ধকার দূর ক'রে দিলি রমা! অপরাধ ত তোদের কিছু ছিল না। আমি আবার কি মার্জ্জনা করবো?"

অনিলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একটা যুগের পরিবর্ত্তন ক'রে দিয়ে, তোরা যে আজ এখানে ফিরে এলি। দু'টো স্নেহের কথা বলে তোদের বেদনাতপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার অধিকার গ্রহণ করতে আজ যে আমার বড়ই লজ্জা বোধ হচ্ছে অনিল! "মা" ব'লে মনে ক'রে তোরা সব কথা ভুলে যা। যা' হয়েছিল তা' যেন হয়নি ব'লে মনে কর্, তবেই আমি তোদের দিকে সহজ সরল ভাবে চাইতে পারবো।"

অনিল কহিল, "কেন মা তুমি এত সঙ্কুচিত হ'চ্ছ? আমরা ত সাধ ক'রে তোমার অধিকারে ফিরে এসেছি। এ অধিকারে থাকতে পেলেই আমরা সব চেয়ে বেশী সুখী হব।"

হেমলতার নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "অনিল—অনিল, এতদিন তোদের চিনি নাই। চিনতে চেষ্টাও করি নাই। আজ যে মূর্ত্তি নিয়ে তোরা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিস,

সে যে বড় প্রলোভনের। তোদের পেয়ে আজ আমি ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান লাভ করেছি।” .

শচীন একধারে দাঁড়াইয়া এ মধুর মিলনের দৃশ্য দেখিতেছিল। হেমলতার চক্ষু তাহার প্রতি নিপতিত হইতেই তিনি একটু সঙ্কুচিত ভাবে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

শচীন অগ্রসর হইয়া হেমলতার পদধূলি গ্রহণ করিল। কহিল, “আমিও মা যে তোর সন্তান। আমাকে দেখে লজ্জা কেন মা?”

অনিল কহিল, “এই আমার শচীন-দা'। মানুষের মধ্যে যা' কিছু ভাল—সব আমার এই দাদাটির মধ্যে আছে। পিতা দেবতা, দেবপুত্র কেনই বা না হ'বে? আর একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি মা! শচীন-দা'কে নিয়ে আমি আজই হুগ্‌লী যা'ব। আমাকে সেখানে যাবার জন্য বাবা খুব আগ্রহ ক'রে লিখেছেন। তুমি ততক্ষণ রমার সঙ্গে কথা কও। আমি দেওয়ানজীথানায় দেখে আসি, হুগ্‌লীর কোন নূতন সংবাদ আছে কি না!”

শচীনের সহিত অনিল বহির্ব্বাটীতে প্রস্থান করিল।

৩৩

যতদূর সম্ভব কঠোর ভাবে আচার্য্যের উপর সামাজিক শাসন চলিয়াছে। যোগেশবাবু কিন্তু কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না।

আচার্য্য একান্ত নীরব ভাবে যোগেশবাবুর সমস্ত শাসন উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আচার্য্যের বিরক্তি নাই, আবেদন নাই, কোন প্রকার কৈফিয়ৎ প্রদানের প্রয়াস মাত্র নাই। পূর্ব্বে যেমন নির্ব্বিকারচিত্তে কর্ত্তব্য পালন করিতেন এখনও তিনি সেই ভাবেই চলিতেছেন। এ নীরব উপেক্ষায় যোগেশবাবুর ক্রোধের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মিঃ হীরালাল ঘটিত ব্যপারে যে সমস্ত লোক শচীনকে অবলম্বন করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আজ যোগেশবাবুর অর্থ ও শাসন-দণ্ডের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছেন। যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহারাই এখন নিত্য নূতন ভাবে আচার্য্যকে নির্য্যাতন করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া যোগেশবাবুর নিকট বাহাদুরী লইতেছেন। সমাজের মধ্যে যাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত—কৃতজ্ঞতা এবং চক্ষুলজ্জা জিনিষটা তাঁহারা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। স্বার্থে আঘাত পড়িলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহারা মতের পরিবর্ত্তন করেন। এ পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক তাঁহারা ইহাকে

বুদ্ধিমত্তার নামান্তর বলিয়া প্রকাশ করেন। যে সমাজ জগদীশ আচার্য্যের মত মানব-দেবতাকে ত্যাগ করিতে পারে, সে সমাজের অবস্থা আলোচনা না করিয়াও সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

আচার্য্যকে ত্যাগ করে নাই কেবল অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধ শিক্ষিত গ্রাম্য সম্প্রদায়। তাহাদের নিকট এখনও কৃতজ্ঞতার মূল্য আছে। চক্ষুও তাহাদের একেবারে পর্দাহীন হয় নাই। ইহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস—আচার্য্য দেবতা। মানবের ক্ষুদ্র শক্তি ইহার কোন অনিষ্টই করিতে পারিবে না।

শিক্ষিত সমাজ একটা প্রকাণ্ড অন্যায়কেও ন্যায়ের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে পারে। অশিক্ষিত কৃষকগণের সে ক্ষমতা নাই। তাহারা খাঁটি জিনিষটাই জানে, এবং প্রাণের খাঁটি ভাবটাই অকপটে প্রকাশ করিয়া ফেলে।

আনন্দময়ী যখন বুঝিলেন, যে যোগেশবাবুকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক, তখন তিনি সরযূর সহিত বিশ্বেশ্বরের রাজ্য কাশীধামে চলিয়া গেলেন।

নিষ্ক্রিয় অবস্থায় জীবন-যাপন করাটা মিঃ হীরালালের পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি একদিন বিন্দুরাণীকে বলিলেন, "এখানে থেকে আর কি হ'বে দিদি? একটা কিছু না ক'রে ত চুপ ক'রে বসে থাকৃতে ভাল লাগে না।"

বিন্দুরাণী কহিলেন, "তোমার কথা আমি ভেবে রেখেছি। চল, এখনি সে কথা বাবুর কাছে তুলি গিয়ে।"

বিন্দুরাণী মিঃ হীরালালকে সঙ্গে লইয়া যোগেশবাবুর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

যোগেশবাবু তখন কতকগুলি জটিল মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন। বিন্দুরাণী ও মিঃ হীরালালকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা কি মনে করে হীরালাল?"

বিন্দুরাণী অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "দিন রাত এমন করে খাটুলেই বুঝি তোমার মাথা ধরা সেরে যাবে? শরীরটা বেশী, না কাজই বেশী?"

যোগেশবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "একলা যা'র সকল কাজ দেখ্‌তে হয়, না খাট্‌লে তা'র চল্‌বে কেন?"

বিন্দু। তা'র একটা উপায় কর্‌তেই তোমার কাছে এসেছি। সে দিন বলেছিলে না, একজন ম্যানেজার রাখ্‌বে। তাই কেন রাখ না?

যোগেশ। একটা ভাল লোক পেলে ত আমি বেঁচে যাই।

বিন্দুরাণী যোগেশবাবুর আসনের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "নিতান্ত আপনার লোক না হ'লে ত আর তা'কে ম্যানেজার কর্‌তে পার্‌বে না? আমি ভাব্‌ছিলুম, হীরালালকেই এ কাজটা দেওয়া যাক্। প্রাণের দরদে, দেখে শুনে সে সব কাজ করবে।"

যোগেশবাবু বিস্মিত ভাবে একবার বিন্দুরাণীর প্রতি ও পরে মিঃ হীরালালের প্রতি চাহিলেন। বিন্দুরাণী বলিতে লাগিলেন, "হীরালালের মত শিক্ষিত লোক দু'দিনেই সব কাজ

শিখে নিতে পার্‌বে। তুমিও এ খাটুনীর দায় থেকে রেহাই পাবে।”

যোগেশ। হীরালাল কি এ কাজ কর্‌তে রাজী আছে?

বিন্দুরাণী। রাজী না হ’লেও তাকে রাজী করিয়ে নিতে হ’বে। হীরালালের উপর কি আমাদের জোর নেই?

হীরালাল। জোর কেন থাক্‌বে না দিদি? তোমরা একটা কিছু বল্‌লে, “না” করাটা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে কথা এই, তোমাদের কাছে থেকেও যদি সাধারণ লোক আমার অপমান করে, তবে সেটা বড়ই অসহ্য হ’বে।

যোগেশ। আমাদের আশ্রয়ে থেকে তোমার অপমানটা তোমার পক্ষে যতদূর বেশী হউক আর নাই হউক, আমার কাছে তা’ বড়ই ভয়ানক। তুমি ত জান হীরালাল, যা’রা তোমার অপমানের কারণ, তা’দের আমি কেমন ক’রে নিগ্রহ কর্‌ছি।

হীরালাল। সে কথা যদি আপনি মনে রাখেন, তবে আর আমার দুঃখ থাকে না।

যোগেশ। তবে তাই হউক, হীরালালকেই কাল থেকে ম্যানেজার নিযুক্ত করি। অবসরের অভাবে শরীরটা একেবারে মাটী হ’য়ে গেল।

এত সহজে মিঃ হীরালালকে ম্যানেজার-পদে বহাল করা বিন্দু-রাণীর পক্ষে আশাতীত। তিনি হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, “বরেন যত দিন না দেখে শুনে কাজ কর্‌তে পারে,ততদিন পর্য্যন্ত ত তোমাকে থাক্‌তেই হ’বে হীরালাল! তারপর তুমি অন্য চেষ্টা করো।”

বিন্দুরাণী আর বেশী কথা বাড়াইলেন না। যোগেশবাবুকে বলিলেন, "বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো, গাড়ীটা নিয়ে একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসো।"

যোগেশবাবু কহিলেন, "তাই বেরুবো মনে কর্‌ছি। হীরালালও চল। আসবার সময় দেওয়ানজীকে তোমার কথা বলে আস্‌বো।"

বিন্দুরাণী একজন চাকরকে ডাকিয়া গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিয়া দিলেন।

৩৪

অল্প দিনের মধ্যেই নব নিযুক্ত ম্যানেজার শাসন-কার্য্যে পরিপক্ক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রধান ক্রোধ ছিল শচীন আর অনিলের উপর। মিঃ মুখার্জ্জির প্রতিও তিনি বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। অনিল তাঁহার শাসনের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মিঃ মুখার্জ্জিও একটু শক্ত লোক। ম্যানেজার সাহেব মনে করিলেন, আপাততঃ শচীনের উপরেই প্রতিহিংসার তীরটা নিক্ষেপ করা সহজসাধ্য হইবে।

অর্থ ও ক্ষমতা সদ্ভাবে পরিচালিত হইলে সুবর্ণ ফল প্রসব করে। কিন্তু অসতের হস্তে অর্থ ও ক্ষমতা পিশাচের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়। মিঃ হীরালাল তাঁহার পৈশাচিক কার্য্যের সহায়রূপে অনেকগুলি দুষ্ট লোককে হস্তগত করিলেন। তিনি বুঝিলেন, প্রবল জমীদারের বিশেষ সম্পর্কিত কর্ম্মকর্ত্তা রূপে, তিনি যে ক্ষমতার পরিচালনা করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এমন লোকের সংখ্যা নন্দনপুরে অতি অল্প। তাঁহার অপ্রতিহত শক্তির কাছে সামান্য দুই একটা বাধা বিঘ্ন গণনা না করিলেও চলিতে পারে। তাঁহার পিশাচ-রাজ্যের সহকারী লোকদিগকে তিনি বলিয়া দিলেন, যে কোন উপায়েই হউক, আচার্য্য-পরিবারের এমন একটা কিছু অনিষ্ট করিতে হইবে যেন সমস্ত জীবন কালও তাহারা সে অনিষ্টের কথা বিস্মৃত হইতে না পারে। এ কার্য্য-

সাধনে কোন প্রকার ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

ক্ষমতা পরিচালনের এমনি একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, যাহা বিলাত প্রত্যাগত মিঃ হীরালালের নিকটও উপেক্ষার সামগ্রী বলিয়া মনে হইল না।

সকল মানুষকে ছোট মনে করিয়া মিঃ হীরালাল এতদিন যেমন ভাবে ছিলেন—এখন দেখিলেন, সেই অবস্থায় থাকা অপেক্ষা লোকের সহিত মিশিয়া থাকাই অধিক স্পৃহনীয়। এ মিশ্রনের ফলে হৃদয়ের ছোট বড় অনেক সাধই পূর্ণ হইতে পারে।

শাসন অথবা দমন নীতি তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ইহার নূতন আস্বাদন অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার কাছে বড়ই লোভনীয় হইয়া উঠিল।

মিঃ হীরালালের শাসন পদ্ধতিটা বরেনের নিকট বড়ই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। সে একদিন বিন্দুরাণীকে বলিল, "মামা-বাবুকে ম্যানেজার নিযুক্ত করায় তাঁহার মর্য্যাদার হানি হ'য়েছে। কেন মা, তুমি এমন কাজ করলে ?"

বিন্দুরাণী। আমাদের মঙ্গলের জন্যই তা'কে এ কাজে নিযুক্ত করা হ'য়েছে। বাবুর শরীরটা তত ভাল নয়। এত কাজের বোঝা কাঁধে চাপান থাক্‌লে, তাঁর শরীর অসুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বে। সকল দিক ভেবেই হীরালাল এ কাজ কর্‌তে রাজী হ'য়েছে। তা'র আত্মমর্য্যাদার হানি আর আমাদের উপকার—

এ দু'য়ের মধ্যে আমাদের উপকারটাকেই সে বেশী মনে করে। কাজেই হীরালাল সম্বন্ধে তেমন কিছু মনে কর্‌বার নেই।

বরেন। আমার ধারণা কিন্তু মা, সম্পূর্ণ বিপরীত। মামা-বাবুকে মামাবাবুর মত রাখ্‌লেই আমাদের বেশী মঙ্গল হ'ত। ম্যানেজার করায় অমঙ্গল বেড়ে যাবে!

বিন্দুরাণী একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "এমন কথা কেন তুমি বল্‌ছো বরেন? বাবু কি না বুঝেই এ কাজটা করেছেন!"

বরেন। সে বিচার আমি কর্‌তে আসিনি মা! তবে লোকের অভিশাপ কুড়িয়ে বেড়ানো আমি ত কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না।

বিন্দু। লোকে অভিশাপ কেন দেবে বাবা? কি করেছি আমরা?

বরেন। তার চেয়ে বরং জিজ্ঞাসা কর মা, লোকে কেন অভিশাপ দেবে না? কি না করেছি আমরা?

বরেন কোন দিন এমন করিয়া মাতার সহিত কথা কহে নাই। বিন্দুরাণী বরেনের এ পরিবর্ত্তনে অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তিনি একটু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "মর্য্যাদা রক্ষার জন্য শাসন-নীতি অবলম্বন করায় যদি কাহারও অনিষ্টের সম্ভাবনা হ'য়ে উঠে তবে সে কথা ভেবে চুপ ক'রে বসে থাকাটা ত কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না।"

বরেন। আমি কিন্তু মা, এখনও বুঝে উঠ্‌তে পারি নি, কিসে মর্য্যাদা থাকে আর কিসে যায়। আমার ত মনে হয়,

মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে সব কাজ করা হচ্ছে, তা' না করলেই আমাদের গৌরব বাড়তো। যে সমাজ আচার্য্য ঠাকুরের পদধূলি স্পর্শে পবিত্র হ'য়ে যায়, সেই সমাজ শাসনের নামে তাঁ'কে পরিত্যাগ ক'রে, আপনার অপবিত্রতা বাড়িয়ে তুল্ছে।"

বরেন আরও কি বলিতেছিল। এমন সময় যোগেশবাবু সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি দূর হইতেই বরেনের শেষ কথাগুলি শুনিয়াছিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই তিনি বলিলেন, "পবিত্রতা রক্ষা করার দিকে তোমার যদি এতই বেশী ঝোঁক হ'য়ে থাকে, তবে আর এ অপবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে অপরাধের ভার বাড়িয়ে তুল্ছো কেন, বরেন ?"

প্রতি পদে বাধা পাইয়া যোগেশবাবুর জেদ্ পর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে ভাবে এ কথাগুলি বলিলেন তাহাতে বরেনের হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল। বিন্দুরাণী ও ঘটনাটাকে তুচ্ছ মনে করিতে পারিলেন না। তিনি যোগেশবাবুকে ভাল রকমেই চিনিতেন। কাজেই ভাবিলেন, যোগেশবাবুর বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় পুত্র-স্নেহ অপেক্ষা জেদ্ বজায় রাখারই অধিক সম্ভাবনা।

তিনি বলিলেন, "এখন যাও বরেন। ছেলেমানুষ তুমি, এ সব বিষয়ে তোমার হাত দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।"

ধীরভাবে বরেন বলিল, "কেন প্রয়োজন নেই মা ? আমি কি এ বাড়ীর কেউ নই যে, ভাল মন্দ কোন কথা বল্তে আমার অধিকার নেই ? আমি হাজার বার জোর করে বল্বো, আচার্য্য

ঠাকুরের প্রতি যেন অন্যায়ভাবে আর কোন অত্যাচার করা না হয়।”

যোগেশবাবু ক্রোধের বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া বলিলেন, “এখানে দাঁড়িয়ে এ কথা বল্‌বার তোমার অধিকার নেই। যদি এ সব কথা তোমার বল্‌তেই হয়, তবে স্থানান্তরে যাও।”

বরেনের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। বলিল, “আমি কাছে থাকাটা যদি আপনার অনভিপ্রেত হয় তবে না হয় দূরেই যাব। কিন্তু তবু আপনি—।”

যোগেশবাবু বরেনের কথা শেষ না হইতেই বলিলেন, “এখন আমি অন্য কাজে ব্যস্ত আছি। তোমার কথা আর এক সময় শুন্‌বো।”

অন্য কথা না কহিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বরেন সে গৃহ ত্যাগ করিল।

৩৫

বড়ই হতাশভাবে বরেন আচার্য্যের পদতলে আসিয়া বসিল। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা নীরব বেদনা আকুল উচ্ছ্বাসে সহিষ্ণুতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতে উদ্যত হইতেছিল, দেখিয়াই আচার্য্য তাহা বুঝিলেন। বলিলেন, "এত অধীর কেন দেখ্‌ছি বাবা!"

অবনত মস্তকে বরেন বলিল, "আপনার এ স্নেহ-সম্ভাষণের আমি ত একেবারেই অনুপযুক্ত। মানুষের চেষ্টায় যতদূর সম্ভব, আমরা আপনাকে নির্য্যাতন করতে ত্রুটী করি নাই। তবু কেন যে আপনার এত অনুগ্রহ-দৃষ্টি, তা, আমি ধারণাই করতে পারি না।"

হাসিতে হাসিতে আচার্য্য কহিলেন, "পাগলের মত এ সব কি বল্‌ছ বরেন। মানুষ কি কখনও মানুষকে নির্য্যাতন করতে পারে? সবই ভগবানের ইচ্ছা। আমরা ত তাঁ'র খেলার পুতুল। আমাদের কি ক্ষমতা আছে বাবা!"

বরেন স্থির দৃষ্টিতে আচার্য্যের মুখের প্রতি চাহিল। কি শান্ত দেবোপম মূর্ত্তি! বিকারশূন্য হৃদয়ের কি নির্ম্মলভাব নয়নে বদনে উদ্ভাসিত! শ্রদ্ধায় বরেনের মস্তক আচার্য্যের পদতলে লুটিয়া পড়িল।

আচার্য্য বরেনের হাত ধরিয়া বলিলেন, "উঠে বসো বাবা!"

এমন সময় দীপ্তি আসিয়া বলিল, "ঠাকুরের আরতির আয়োজন হ'য়েছে।"

আচার্য্য বরেনকে বলিলেন, "এসো বাবা, ঠাকুরের আরতি ক'রে আসি।"

বরেনকে লইয়া আচার্য্য পূজা গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ভক্তিভাবে আরতি আরম্ভ করিলেন।

যুক্তকরে দীপ্তি তৃপ্তি আচার্য্যের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ-নেত্রে আরতি দেখিতেছিল।

বরেন এ দৃশ্যে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এ যেন এক দেব-স্থান—পুণ্যময়, পবিত্রতামাখা।

দারুণ উত্তাপের পর স্নিগ্ধ সমীরণ যেমন একটা শীতল ছায়া বিস্তৃত করিয়া দেয়, বরেনের উত্তেজনাতপ্ত প্রাণে ও এ মধুর ভাব একটা শান্ত প্রস্রবনের শীতলধারা ছুটাইয়া দিল। আরতি সমাপ্ত হইলে বরেন ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া বিদায় লইল।

যেমন প্রতিদিন হয় আচার্য্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তৃপ্তির সহিত ভগবানের প্রসঙ্গ করিলেন। রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া তিনি দীপ্তি তৃপ্তিকে শয়ন করিতে বলিলেন। মধ্য রাত্রির পর একটা অভাবনীয় দুঃস্বপ্ন দর্শনে আচার্য্যের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যা ত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি বাহিরে অস্ফুট কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন। দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই—কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক আচার্য্যকে ধরিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত, পা ও মুখ বাঁধিল। এ আকস্মিক ঘটনার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া আচার্য্য ভগবানকে স্মরণ করিলেন। অন্য গৃহে দীপ্তি, তৃপ্তি যেন যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছে ইহাও আচার্য্যের কর্ণগোচর হইল।

আচার্য্য মনে করিলেন, "এ কি নির্ম্মম পরীক্ষা ভগবান্! পিতার চক্ষের উপর সন্তানের প্রতি অত্যাচারের দৃশ্য তুলে ধরছো কোন অভিপ্রায়ে প্রভো!"

অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন লোক বন্ধনাবস্থায় দীপ্তি, তৃপ্তিকে শয়ন-গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া আসিল; এবং কাল বিলম্ব না করিয়া বাড়ীর বাহিরে লইয়া গেল। আচার্য্যকে উঠানের মধ্যে রাখিয়া অন্য লোকগুলিও প্রস্থান করিল।

আচার্য্য দেখিলেন, লোকগুলি বাহির হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বহির্ব্বাটীর গৃহগুলি জ্বলিয়া উঠিল।

অতিকষ্টে গৃহ-দেবতার মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া আচার্য্য মনে মনে কহিলেন, "কি নিষ্ঠুর লীলার অভিনয় তোমার এ দেবতা! এ অগ্নি-পরীক্ষায় তোমার যে কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হ'বে, তাহা ত ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব আমি স্থির করতে পাচ্ছি না।"

অগ্নির রক্ত-জিহ্বা আচার্য্যের প্রায় সমস্ত গৃহেই লেহন আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাড়ীখানা হুতাশনের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া উঠিল।

গভীর রাত্রির উজ্জ্বল আলোক দৃষ্টে গ্রামবাসী অনেকেই আচার্য্যের গৃহ-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সাহস করিয়া কেহ ভিতরে প্রবেশ করিল না।

গ্রামের নিকটবর্ত্তী কৃষকেরা যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন বহির্ব্বাটীর সমস্ত গৃহগুলি প্রায় ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কৃষক-দিগের মধ্যে কয়েকজন অসীম সাহসের সহিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে

প্রবেশ করিল। উঠানের মধ্যে অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় আচার্য্য পতিত ছিলেন। একজন আচার্য্যকে তুলিয়া দূরে লইয়া গেল। এবং অবশিষ্ট লোকেরা ভিতর হইতে অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিতে লাগিল।

কৃষকগণের পরিশ্রমে ও যত্নে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল সত্য, কিন্তু আচার্য্যের দেব-মন্দির ও অন্য একখানি গৃহ ব্যতীত আর কিছুই রক্ষা পাইল না।

আচার্য্যের নিকটে যাইয়া একজন কৃষক জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি দেবতা? দাদাঠাকুর কোথায়? দিদিমণিরাই বা কই? আপনাকেই বা এমন করে বেঁধে রেখে গেল কা'রা?"

আচার্য্য শূন্য দৃষ্টিতে একবার কৃষকের মুখের প্রতি চাহিলেন। বলিলেন, "ভগবানের এই ইচ্ছা, রতন। শচীন হুগলীতে আছে। আমাকে যে অবস্থায় দেখেছিলে, দীপ্তি, তৃপ্তিকেও কা'রা যেন সেই রকম করে বেঁধে নিয়ে গেছে।"

রতন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "এ কথাগুলোও আপনি এমন ঠাণ্ডা ভাবে বল্‌ছেন ঠাকুর? আমরা বুঝেছি কার এ কাজ। ঠাকুর, আপনি কিছু বলেন আর নাই বলেন, আমরা একবার দেখে নেবো, এমনি ধারা পিশাচ কাঁধের উপর মাথা রেখে কেমন করে বেঁচে থাকে! আমরা পাঁচশো ঘর চাষা আছি, পাঁচশো লোক জান কবুল ক'রে এর প্রতিশোধ নেবো। ঘর দোর পুড়িয়ে, গৃহস্থের মেয়ে চুরি করে নেওয়ার শোধটা যদি দিতেই না পারি, তবে আর বেঁচে আছি কেন?"

ততক্ষণ গ্রামবাসী সকলেই আসিয়া আচার্য্যকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আচার্য্যের বর্ত্তমান অবস্থায় সকলের হৃদয়েই একটা তীব্র-বেদনার উদ্রেক হইল।

কৃষক রতন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সকলেই আমরা মা বোন নিয়ে ঘর করি। এদের উপর যে অত্যাচার করে, তা'র মাথাটা ছিঁড়ে না ফেল্লে যে সে অপমানের প্রতিশোধ হয় না। যা'র ইচ্ছে হয় এ'সো, প্রতিজ্ঞা করি—দুনিয়া তন্ন তন্ন ক'রে দিদিমণিদের খুঁজে বা'র্ কর্‌বো। আর যা'রা এ কাজ করেছে, তাদের রক্তে দিদিমণিদের অভিষিক্ত করে, ঘরে ফিরিয়ে আন্‌বো। সাহস যাদের না হয়, মা বোনের প্রতি অত্যাচারে যাদের শিরার রক্ত গরম হ'য়ে না ওঠে, তাদের আমরা চাই না। এ অত্যাচারের শেষ না করে কেউ ঘরে ফির্‌বো না। কেমন, তোমরা রাজী আছ কি না শুন্‌তে চাই।"

কৃষকগণের মধ্যে সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমরা খুব রাজী আছি।"

প্রবল বায়ুর তাড়নায় বৃক্ষ যেমন কাঁপিতে থাকে, রতনও তেমনি উত্তেজনায় কম্পিত হইতেছিল।

আচার্য্য ধীর কণ্ঠে বলিলেন, "এ সব কি রতন! আমার দীপ্তি, তৃপ্তিকে যে আমি ভগবানের চরণে উৎসর্গ করে রেখেছি। তাদের অনিষ্ট কে কর্‌বে? ভগবানের চেয়ে ভাল রক্ষক ত আর কেউ নেই! কেন এত অধীর হচ্ছ বাবা?"

রতন চীৎকার করিয়া বলিল, "কখনও আপনার অবাধ্য হইনি ঠাকুর, কিন্তু এবার মাপ করবেন। দাদা-ঠাকুর এখানে নেই। আমরা তাঁ'র অনুগত শিষ্য। আমরা হাজার হাজার লোক গ্রামে উপস্থিত থেকেও তাঁ'র মান ইজ্জত বজায় রাখ্‌তে পারলুম না। আমরা এর প্রতিশোধ নেবোই ঠাকুর। গ্রামের মধ্যে যত জোয়ান লোক আছি সকলে একসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছি, প্রাণ দিয়েও এ কাজ উদ্ধার করবো। আমরা চল্লুম ঠাকুর! আপনার দেবতার কাছে প্রার্থনা করুন, যেন আমরা কাজ হাঁসিল করে ফিরে আস্‌তে পারি।"

বাঁধ ভাঙ্গা জল-স্রোতের ন্যায় কৃষকগণ সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

গ্রামবাসী কয়েকজন লোক আচার্য্যকে ধরিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেল।

৩৬

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যের বিপদ-কাহিনী গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সংবাদ শুনিয়াই বরেন আচার্য্যের বাড়ীর নিকট গিয়াছিল, কিন্তু আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে এমন সাহস তাহার ছিল না। বরেন ঠিকই বুঝিয়াছিল, এ কাজ কে করিয়াছে! লোকমুখে নানাপ্রকার অপ্রিয় কথা শুনিয়া আহত-প্রাণে বরেন মাতার নিকট ফিরিয়া আসিল। যোগেশবাবুও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বরেনকে দেখিয়া যোগেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্যের বাড়ী থেকে ফিরে এলে নাকি বরেন?"

"হাঁ, বাবা!" বলিয়া বরেন নতমস্তকে দাঁড়াইল।

যোগেশ। এ বিপদের সময় পূর্ব্ব শত্রুতা বিস্মৃত হ'য়ে একবার এখানে আসা আচার্য্যের খুবই উচিত ছিল।

বরেন। তিনি এখানে কেন আস্‌বেন বাবা?

যোগেশবাবু বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "তবে কি তাঁ'র বিপদের কথা সত্য নয়?"

বরেন। আমরা যা'কে বিপদ বলি, তিনি ত তাহা বিপদ ব'লে মনে করেন না। এ অবস্থায়ও তাঁর সৌম্য মূর্ত্তি দেবত্বের পরিচায়ক।

যোগেশ। যা' ঘটে গেছে তা' আর ফেরান যাবে না; কিন্তু যথাসাধ্য প্রতীকারের চেষ্টা করা ত সঙ্গত।

বরেন মনের আবেগ যথাসম্ভব প্রশমিত করিয়া বলিল, "প্রতীকারের চেষ্টা কে কর্‌বে বাবা? আচার্য্যের এ অনিষ্ট কে ক'রেছে ব'লে আপনি মনে করেন?"

যোগেশ। অনুসন্ধান না ক'রে ত সে কথা বলা যায় না।

বরেন। আমি জানি কা'র দ্বারা এ কাজ হ'য়েছে। কিন্তু লোকের বিশ্বাস অন্যরূপ।

যোগেশ। লোকে কি বলে বরেন?

বরেনের আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। কহিল, "সে কথা আমি মুখ দিয়ে বা'র্ কর্‌তে পার্‌বো না, বাবা! জিহ্বা আমার অসাড় হ'য়ে যাবে।"

যোগেশ। এমন কি গুরুতর কথা বরেন?

বরেন মাতার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "মা—মা! আর আমার বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এমন ভাবেই আমরা আচার্য্যকে উৎপীড়ন ক'রে এসেছি যে, এখন যা' নয়, সে কথাই লোকে জোর ক'রে বলে বেড়াচ্ছে। কি যে লোকে বল্‌ছে—তা' শুন্‌লেও যে আমার মর্‌তে ইচ্ছে হয় মা!"

যোগেশবাবুর যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "তবে কি এ কাজ আমি করেছি বলে লোকের মনে বিশ্বাস?"

বরেন। লোকে ত তাই বল্‌ছে বাবা! কিন্তু তা'রা জানে না, কে এ কাজ করেছে।

বরেনের কথা সমাপ্ত না হইতেই সৌরভি ঝি একপ্রকার হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে আসিয়া বলিল, "দেখ সে বাবু, যারা

সব আচায্যির ঘর জ্বালিয়ে মেয়ে চুরি করেছে, তা'দিগকে মেনেজার বাবু বেঁধে এনেছেন।"

যোগেশবাবু কহিলেন, "কার কথা বল্‌ছিস্ রে ঝি ?"

সৌরভি ব্যস্তভাবে কহিল, "কাদের কথা আবার কইব ? সব চোর ডাকাত। ষণ্ডা ষণ্ডা চেহারা, লাল ভাঁটার মত বড় বড় চোখ্। দেখ্‌লে গা শিউরে ওঠে। চল না বাবু, দেখ্‌বে তাদের।"

যোগেশবাবু অন্য কথা না বলিয়া বহির্ব্বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। বরেনও তাঁহার অনুসরণ করিল।

সেই সময় বহির্ব্বাটীতে এক বিরাট দৃশ্যের অভিনয় চলিতেছিল। দারোগা, চৌকিদার, গ্রামের ভদ্র অভদ্র বহুলোকে যোগেশবাবুর বহির্ব্বাটীর বিস্তীর্ণ প্রাস্তর পরিপূর্ণ।

যোগেশবাবুকে দেখিয়াই ম্যানেজার মিঃ হীরালাল বলিলেন, "এরাই সব আপনার শিক্ষিত চাষা প্রজা। শিক্ষার ফল্‌টা প্রথমে শিক্ষকের উপর দিয়েই প্রকাশ ক'রে ফেলেছে। জনকত আপাততঃ ধরা পড়েছে। বাকী সব পলাতক। দারোগা সাহেব কহিলেন, "চাষাদের দলপতিই হচ্ছে রত্‌না ; সে বেটাকে এখনও খুঁজে পাইনি। অম্‌লা আর শিবে, এ দু'বেটাকেই কায়দামত আট্‌কান হয়েছে। কাল রাত্রি একটার সময় মহল্লার চৌকিদার এ দু'বেটাকে জগদীশ আচার্য্যের বাড়ীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে।"

ম্যানেজার দারোগাকে বলিলেন, "আপনি এ দু'বেটাকে

চালান দিন। এদের দলের আর যারা সব বাড়ীতে আছে—তাদের উপর কড়া নজর রাখুন।”

যোগেশবাবু কহিলেন, “এত সাহস যা'দের, তা'রা বড় সোজা মানুষ মনে করবেন না দারোগা সাহেব! ব্যাপার যখন আপনার হাতে পড়েছে তখন একটা কিনারা হবেই।”

দারোগা। একবার ঘটনাস্থলে যে'তে হ'বে। আপনিও চলুন যোগেশবাবু!

সকলেই জগদীশ আচার্য্যের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

এতগুলি লোকের একত্র আগমনে আচার্য্যের দগ্ধ গৃহদ্বার অপ্রত্যাশিত ভাবে কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিল।

যোগেশবাবু আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আপনার উপর যা'রা অন্যায় ভাবে উৎপীড়ন করেছে, দারোগা সাহেব তাদের বেঁধে এনেছেন—সাম্‌নে একবার চেয়ে দেখুন।”

আচার্য্য দেখিলেন, অমূল্য ও শিবুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি কহিলেন, “আপনি কি বল্‌ছেন যোগেশবাবু? অমূল্য, শিবু এরা যে আমার শচীনের চেয়েও বেশী। আমার উপর অত্যাচার করেছে ব'লে কে এদের বাঁধ্‌তে বল্লে?”

দারোগা। আপনি ব্রাহ্মণ—সোজা মানুষ। লোক চেনা কি আপনার কাজ? এদের চোখে মুখে অত্যাচারের কথা লেখা আছে।

আচার্য্য। না—না—দারোগা সাহেব! অমূল্য আর শিবু আমার উপর কোন অত্যাচার করে নাই! বিনা কারণে যদি

এদের প্রতি উৎপীড়ন চল্‌তে থাকে—তবেই আমার উপর প্রকৃত অত্যাচার করা হ'বে। আপনি এদের ছেড়ে দিন।

দারোগা একটু হতাশভাবে বলিলেন, "এখন কি করা যায় ম্যানেজার বাবু?"

ম্যানেজার। বোধ হয় ঠাকুরের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। রত্‌নার কথাটা একবার জিজ্ঞাসা করুন্ না?

দারোগা আচার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "চাষাদের দলের সর্দ্দার হচ্ছে রত্‌না। চৌকিদারেরা রত্‌নার সঙ্গে এই অম্‌লা ও শিবেকে আপনার বাড়ীর চারধারে ঘুর্‌তে দেখেছে।"

আচার্য্য। বাড়ীর চারিদিকে কেন দারোগা সাহেব, আমার বাড়ীর ভিতর ওদের দেখ্‌লেও ত কোন দোষের হ'ত না। ওরা যে আমার বড় আপনার। ওদের প্রাণে যে ভগবানের আসন পাতা আছে।

দারোগাসাহেব ধমক্ দিয়া শিবেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্ না বেটা, তোর কি বল্‌বার আছে।"

স্বাভাবিক স্বরে শিবু উত্তর করিল, "এ সব কাজ করিনি বলে কোন সাফাই দিতে আমরা নারাজ। ঠাকুরের মনের বিশ্বাসই আমাদের সাফাই বা অপরাধের শেষ প্রমাণ। আর কিছু আমরা বল্‌তে চাই না।"

দারোগাসাহেব একটা ধাক্কা দিয়া শিবুকে দূরে সরাইয়া দিলেন।

ম্যানেজার। আমি আগেই বলেছি, ঠাকুরের মাথা বোধ হয় খারাপ হ'য়ে গেছে। কাজেই এ কথার উপর নির্ভর ক'রে এমন গুরুতর অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়াটা সঙ্গত হ'বে না। আপনি এদের বেঁধে নিয়ে চলুন।

দারোগাসাহেব সম্মতির জন্য একবার যোগেশবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন।

যোগেশবাবু কহিলেন, "ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে বোধ হচ্ছে।"

দারোগা। তবে এদের চালান দেওয়াই স্থির হ'লো। চল্ বেটারা, এবার টের পাবি কোন কাজের কি মজা!

অমূল্য। চলুন না, কোথায় নিয়ে যাবেন। সাপের মুখে যে'তেও আমরা ভয় পাব না।

দারোগা। তা' ভয় পা'বে কেন? বেটাদের কি বুকের পাটা দেখ্ছেন ম্যানেজার বাবু!

দারোগাসাহেবের ক্রোধ এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হইল যে, অমূল্য ও শিবু স্খলিতপদে ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

বরেন এতক্ষণ একধারে নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার কেবলি মনে হইতেছিল—এত বড় একটা মিথ্যা কেমন করিয়া এতক্ষণ এতগুলি লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে?

নিষ্ঠুর প্রহারে যখন অমূল্য ও শিবু ভূতলশায়ী হইল, তখন আর বরেন স্থির থাকিতে পারিল না। যোগেশবাবুর পা'দু'খানি ধরিয়া কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "এ প্রহসনের অভিনয়

এখানেই থামিয়ে দিন বাবা! আর ভগবানের অভিশাপ মাথা পেতে নেবেন না!"

বরেনের কথায় সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

ম্যানেজার দেখিলেন, এ একটা নূতন উৎপাতের সৃষ্টি হইল। তিনি দারোগাকে বলিলেন, "এখানে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই!"

দারোগা ম্যানেজারের ইঙ্গিতে অমূল্য ও শিবুকে লইয়া থানার দিকে অগ্রসর হইলেন।

বরেন দেখিল, তাহার কথা কোন কাজেই লাগিল না। সে দৌড়াইয়া অমূল্য ও শিবুর পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল। বলিল, "এদের হাত-কড়া খুলুন্ দারোগাসাহেব! যদি হাত-কড়া লাগাতেই হয় তবে অপরাধীর হাতেই সেটা লাগিয়ে দিন। এ নির্দ্দোষ লোক দু'টাকে কেন পীড়ন কচ্ছেন? আমি এদের কিছুতেই নিয়ে যেতে দিবো না।"

পথের মধ্যে একটা কেলেঙ্কারী হয় দেখিয়া যোগেশবাবু দারোগাকে বলিলেন, "আপনি আপাততঃ এদের ছেড়ে দিন। একটু ভেবে পরে কর্ত্তব্য স্থির করা যাবে।"

দারোগা। বাদী যখন কেউ হ'চ্ছেন না, তখন এদের ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

অমূল্য ও শিবুর বন্ধন মুক্ত করিয়া সকলেই যোগেশবাবুর ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

৩৭

দুই দিনের মধ্যেই রমা হেমলতার সমস্ত প্রাণখানি অধিকার করিয়া বসিল। রমার হৃদয়ের স্বাভাবিক সৎ-ইচ্ছার উৎস এমন ভাবেই হেমলতার প্রাণে প্রভাব বিস্তার করিল, যে হেমলতা সে প্রবাহে আত্মহৃদয়ের সমস্ত কলঙ্ক-কালিমা বিধৌত করিয়া যেন একটা নূতন জীবন লাভ করিলেন। লজ্জার যাহা কিছু ছিল, যাহাতে সঙ্কোচের ছায়া ফুটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল—সমস্ত যেন কোন্ এক ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে হেমলতার হৃদয় ছাড়িয়া পলায়ন করিল। নয়নে নূতন আলোক—হৃদয়ে নবীন ভাব—সংসারটা যেন এক অভিনবরূপে সজ্জিত হইয়া উঠিল। বিলাসের ক্ষণস্থায়ী আশা নিরাশার জ্বালাময় ঘাত-প্রতিঘাতের পরিবর্ত্তে একটা শান্তোজ্জ্বল স্থায়ী সৌন্দর্য্যের ছবি যেন আপনা হইতেই হেমলতার চারিদিকে ফুটিয়া উঠিল। হেমলতা মনে প্রাণে বুঝিলেন, এই পরম পরিতৃপ্তি উপেক্ষা করিয়া তিনি এতদিন কোন বালুকা-ধূসর মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন। স্বাভাবিক সরল পথ ছাড়িয়া কল্পনাময় উচ্ছৃঙ্খল পথে বিচরণ করিবার প্রয়াস যে কত যন্ত্রণাদায়ক হেমলতা এখন ভাল করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। সাংসারিক খুঁটি নাটি জিনিষের মধ্যে যে এত আনন্দ পাওয়া যায় হেমলতা পূর্ব্বে তাহা ধারণা করিতেই পারেন নাই। এখন রমার সাহচর্য্যে

সে আনন্দ যেন বিনা আয়াসেই প্রাণের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

রমার মুখে আচার্য্যের দেবভাব ও শচীনের আত্মত্যাগের কাহিনী শুনিতে শুনিতে—বিমলের প্রাণটাও যেন সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। সে ঠিক করিয়া রাখিল, যেমন করিয়াই হউক্ শচীনের মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে।

একদিন একটী বিধবা কয়েকজন শিশু সন্তান লইয়া—হেমলতার নিকট নিজের দুঃখ-কাহিনী প্রকাশ করিতেছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর গৃহের তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া সে এত দিন কোন প্রকারে শিশুগুলির মুখে অন্ন দিয়াছিল, কিন্তু এখন একেবারে নিরুপায়। সম্ভ্রমের খাতিরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। বিধবার বেদনাময় প্রার্থনায় রমার হৃদয়ের কোমল ভাবগুলি ব্যথিত হইয়া উঠিল। অন্নাভাবে বালক-বালিকাগুলির শীর্ণদেহ—উপায়হীনা বিধবার জীর্ণ চীর-বসন—ত'ার অবসাদমাখা নয়নের সলজ্জ দৃষ্টি—প্রথম ভিক্ষার কৌশলহীন সরল আত্ম-নিবেদন, রমার নয়নে অশ্রু আনয়ন করিল।

রমা কহিল,—"এ অন্নহীন ছেলেগুলির মুখে দু'টো অন্ন তুলে দেবার শক্তি কি আমাদের নেই মা? মাসীমা কাশী যাবার পূর্ব্বে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন। সে টাকা-গুলি এ কাজে ব্যয় কর্‌লে, এমন অনেক বিধবার ত অন্নের সংস্থান হয়।"

হেমলতা প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে—করুণামাখা রমার মুখখানির

প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"তোমার টাকা এখন রেখে দেও মা! আমিই এদের উপায় করে দিচ্ছি। গ্রামের মধ্যে এমন অসহায় পরিবারের সাহায্যের জন্ত দেওয়ানজীকে হুকুম দেওয়াই আছে। সকল দিক দেখে কাজ করে এমন লোক এখানে কেউ নাই। আর আমার কাছেও পূর্ব্বে এমন ভাবে কেউ আসেনি। বিমলকে দিয়ে আজ থেকেই এ কাজটা আরম্ভ করা যাক্। রমার ভাণ্ডার চিরদিন অক্ষয়। কাজেই এ ভাণ্ডারের নামও হউক "রমা-ভাণ্ডার।" এই রকম উপায়হীনা বিধবা অথবা অন্ধ, আতুর যতগুলি আছে তা'দের একটা তালিকা করে এ ভাণ্ডার থেকে সাহায্য দেবার বন্দোবস্ত কর্‌তে হ'বে।"

রমা। তাই কর মা! অন্নহীনের আশীর্ব্বাদ বৃষ্টি-ধারার স্থায় তোমার মস্তকে বর্ষিত হ'বে।

হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া বিমল বলিল—"পিসে ম'শাই মোকদ্দমায় জিতেছেন পিসিমা! এই চিঠি দেখ!"

আগ্রহের সহিত রমা চিঠিখানি গ্রহণ করিল এবং হেমলতাকে পড়িয়া শুনাইল।

হেমলতা বলিলেন,—"এ সুসংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই রমা-ভাণ্ডারের কাজ আরম্ভ হউক। পার্‌বি ত বিমল, যা'রা সব অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছে—তা'দের খোঁজ ক'রে সাহায্য কর্‌তে?"

বিমল। পার্‌বো বই কি পিসিমা! এযে খুব ভাল কাজ। তোমার নামে আর একখানা চিঠি আছে। এই নেও রমা।

রমা চিঠিখানি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। পূর্ণিমার চন্দ্রকে মেঘে ঢাকিয়া ফেলিলে যেমন হয়, রমার মুখখানিও তেমনি মলিন হইয়া গেল। উদাসভাবে হেমলতার মুখের দিকে চাহিয়া রমা বলিল,—"মা—মা—দেবতার উপর যা'রা এমন অত্যাচার কর্‌তে পারে তা'রাও জনসমাজে মানুষ ব'লে পরিচয় দেয়। আমি যে আর বস্‌তে পাচ্ছি না মা! আমার মাথাটা একেবারে ঘুরে গেছে। চিঠিখানা পড়ে দেখ না!"

রমা হেমলতার হস্তে পত্রখানি দিল।

নয়নের জল সম্বরণ করা রমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। দুই হস্তে নয়ন আবৃত করিয়া রমা কাঁদিতে লাগিল।

পত্রে বরেন আচার্য্যের বিপদ-কাহিনী রমাকে জানাইয়াছে; এবং শচীনকে এ সংবাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছে।

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে রমা বলিল,—"কি হ'বে মা! ঠাকুর যে এখন একান্ত একাকী—অসহায়। এ সংবাদ এখনি হুগ্‌লীতে পাঠাতে হ'বে।"

হেমলতা রমার মুখখানি মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন "দেওয়ানজীকে ডেকে আমি এখনই হুগ্‌লী পাঠাচ্ছি, রমা! বাবুর মোকদ্দমায় শচীন যা' করেছে তা' নিতান্ত আপনার লোকেও করে না। আমাদের জন্যই ত শচীন বাড়ী ছেড়ে গেছে। যদি বল, তবে আচার্য্যঠাকুরকে আন্‌বার জন্যও লোক পাঠিয়ে দেই।"

রমা। লোক পাঠান মিছে। এখন তিনি কিছুতেই আস্‌বেন না মা! দেওয়ানজীকে ডেকে এখনই হুগ্‌লী পাঠিয়ে দেও। প্রথমে খবরটা যেন বাবার কাছে দেয়। তিনি শচীনঠাকুরকে জানাবেন।

হেমলতা আর বিলম্ব করিলেন না। বিমলের দ্বারা দেওয়ান-জীকে হুগ্‌লী রওনা হইবার জন্য বলিয়া দিলেন। বরেনের চিঠিখানাও সেই সঙ্গে পাঠাইলেন। রমাকে বলিলেন,—"জীবনে অনেক রকম পরীক্ষার মধ্যে পড়্‌তে হয় রমা! মনে হচ্ছে এ বিপদের মধ্যেও বুঝি ঠাকুরের মহত্ত্ব আরও স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠ্‌বে।"

বিধবাটিকে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া হেমলতা কহিলেন,—"এখন তোমরা এসো বাছা!"

আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে শিশু সন্তানগুলি লইয়া বিধবাটি প্রস্থান করিল।

৩৮

নরেশের মনে হইতে লাগিল যেন একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্নের পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। যাহা তিনি করিতে গিয়াছিলেন, তাহা যেন এখন তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ক্ষণিক মোহের উত্তেজনায়, বিজয়বাবুর অগাধ বিশ্বাসের বিনিময়ে, তিনি যে এতবড় একটা বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতে উদ্যত হইবেন, ইহাত তিনি একবারও ভাবেন নাই। বিজয়বাবুর সাজানো সুখের সংসারটি অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিবার কল্পনা যে এমন ভাবে তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইবে, এ চিন্তাও যেন তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল।

শিক্ষিত তিনি। বিদ্যার অভিমান, চরিত্রের অভিমান, সভ্যতার অহঙ্কার সমস্ত যে চূর্ণ হইয়া গেল। আজ যে তিনি ধূলি হইতেও মলিন—পশু হইতেও অধম—পিশাচ হইতেও ঘৃণ্য।

অশিক্ষিতা হেমলতা যে ভাবে আপনাকে সংযত করিয়া লইলেন, তিনি ত তাহা পারেন নাই। প্রাণের পঙ্কিল বাসনার কাছে যে তিনি আত্ম বলিদান করিয়াছিলেন!

দুর্ব্বল রমণীর পিপাসা-কাতর প্রাণে শক্তির সঞ্চার না করিয়া তিনি যে তাঁহার পিপাসা বাড়াইয়া তাঁহাকে অতল জলধিতলে নিমজ্জিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। শিক্ষকের আসনে বসিয়া তিনি যে কুশিক্ষার প্রলোভন-পাশে তাঁহার চঞ্চলমতি ছাত্রীকে

বাঁধিয়া ফেলিতে মনন করিয়াছিলেন। এমনি ভাবে শিক্ষকের আসন কলঙ্কিত করিয়া তিনি যে আজ আত্মগ্লানিতে মৃতপ্রায়। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অবলম্বন করিবার ত তাঁহার কিছুই নাই। আজ তিনি দারুণ অপরাধের ভারে নিষ্পেষিত।

প্রাণের মধ্যে বিবেক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—যাও হতভাগ্য, করজোড়ে জানু পাতিয়া হেমলতার নিকট ক্ষণিক ভ্রান্তির জন্য অপরাধ স্বীকার করিয়া পাপের ভার লাঘব কর। বিজয়বাবুর চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর। আর ভগবানের কাছে আত্ম-সমর্পন করিয়া প্রজ্জ্বলিত তুষানলে প্রাণের পাপ ভস্মীভূত কর।

নরেশের পক্ষে এ বাড়ীতে অবস্থান করা আর সাজে না। কিন্তু বিনা কারণে সহসা চলিয়া গেলে লোক-চক্ষে তাঁহার ব্যব-হারটা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে। এ মহাসমস্যার সমাধান নরেশের নিকট বড়ই কঠিন বোধ হইতে লাগিল। অবসর মত একবার হেমলতার সাক্ষাৎ পাইলে বুঝি এ মীমাংসা সহজ হইত। তিনি সে অবসর খুঁজিতে লাগিলেন।

ভ্রম সংশোধনের পর হেমলতার চিত্তবৃত্তিগুলি একেবারে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহার দুঃস্বপ্নের মোহ যেন একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। তিনিও বিস্মিত ভাবে ভাবিতে-ছিলেন—হায়, হায়! কি সর্ব্বনাশের চেষ্টাই আমি করিতেছিলাম। স্বামীর এত সোহাগ যত্নের পরিবর্ত্তে কি কৃতঘ্নতার পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এ পাপের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই!

বিমল আসিয়া কাছে দাঁড়াইতে হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে বিমল ?"

বিমল। এই ত পড়া শেষ ক'রে আস্‌ছি পিসিমা!

হেমলতা। এখন বুঝি ক্ষিদে পেয়েছে।

বিমল। খাবারটা পড়বার ঘরে পাঠিয়ে দেও। মাষ্টার ম'শায়ও সেখানে আছেন।

এবার হেমলতা মাষ্টার মহাশয়ের নামে চমকিয়া উঠিলেন না। বলিলেন, "তুই যা। আমি জলখাবার নিয়ে যাচ্ছি!"

বিমল। আমি ততক্ষণ একবার দেওয়ানজীখানা হ'তে চিঠি-গুলি নিয়ে আসি। যদি বাবুর কোন খবর থাকে।

বিমল চলিয়া গেল।

পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া হেমলতা দেখিলেন, নরেশ অতি বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া আছেন। রেকাব দু'খানি টেবিলের উপর রাখিয়া হেমলতা স্থির ভাবে দাঁড়াইলেন।

নরেশ ডাকিল, "হেম্!"

হেমলতা স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর করিল, "বলুন।"

নরেশ। আমায় কি তুমি মাপ কর্‌তে পেরেছ?

হেমলতা নরেশের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আপনি যে আমার শিক্ষক।"

নরেশ। আমি যে একেবারে ধূলো হয়ে গেছি হেম্! আমার পায়ের ধূলো কেন নিচ্ছো?

হেমলতা। আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন, আমি যেন আমার স্বামীর

সহধর্ম্মিণী হ'তে পারি। আপনার পায়ের ধূলো যেন আমাকে সে শক্তি প্রদান করে।

নরেশ। তোমাকে উপদেশ দিতে চেষ্টা করা আর আমার লজ্জা বাড়িয়ে তোলা একই কথা। তবুও যাবার সময় প্রার্থনা করে যাচ্ছি, তোমার এ শুভ ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়।

হেম। আপনি কি চলে যাচ্ছেন?

নরেশ। কালই যাব।

বিমল আসিয়া বলিল, "আজ কোন চিঠি নেই। বোধ হয় পিসেম'শায় বাড়ী ফিরবেন ব'লেই চিঠি লেখেন নাই।"

নরেশের সহিত বিমল জলযোগ আরম্ভ করিয়া দিল।

৩৯

জ্ঞানউন্মেষের সহিত দীপ্তি দেখিল, একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে তাহারা দুই ভগিনী শায়িতা। কেন যে তাহাদিগকে এমন ভাবে এখানে আনা হইল দীপ্তি কিছুতেই তাহার মীমাংসা করিতে পারিল না। সম্মুখেই তৃপ্তি পড়িয়াছিল। দীপ্তির বহুচেষ্টায় তাহার চৈতন্ত ফিরিয়া আসিল।

তৃপ্তির দেহের কম্পন তখনও ভাল করিয়া থামে নাই। সাবধানে তৃপ্তিকে কোলে তুলিয়া দীপ্তি কহিল, "একটু শান্ত হ' বোন। এমন ক'রে ভয়ে কাঁপ্‌লেই ত সকল বিপদ দূরে যাবে না। আর বিপদই বা কি তৃপ্তি? ভগবানের রাজ্য ছাড়িয়ে ত কেউ আমাদের নিয়ে যেতে পার্‌বে না।"

ধীর ভাবে তৃপ্তি কহিল, "বড়ই ভয় হ্‌চ্ছে দিদি! কি যে হ'বে জানিনা। বাবা এতক্ষণ কি কচ্ছেন তা'ও ভেবে ঠিক কর্‌তে পাচ্ছি না।"

দীপ্তি। স্থির মনে একটু ভগবানকে ডাক্ তৃপ্তি—সব দুর্ভাবনা শেষ হ'য়ে যাবে।

তৃপ্তি। প্রাণটাকে ত স্থির কর্‌তে পাচ্ছি না দিদি। যা'রা সব আমাদের এখানে এনে ফেলেছে যদি তা'রা আমাদের দেহের উপর কোন অত্যাচার করে?

দীপ্তি। দেহের উপর যদি কেহ অন্তায়রূপে অত্যাচার করে

প্রাণত তা'তে কলুষিত হ'বে না তৃপ্তি! আর প্রাণই যদি কলুষিত না হয়, তবে দেহে অপবিত্রতা আস্‌বে কেমন ক'রে? আর যদিই বা এমন অত্যাচারের সম্ভাবনা হ'য়ে ওঠে, তবে ঠিক জানিস্ আমাদের প্রাণ থাক্‌তে দেহের পবিত্রতা নষ্ট করে এমন শক্তি কা'রও নেই। এতটুকু সাহস যদি তোর প্রাণে না থাকে তবে এতদিন বাবার পায়ের তলায় পড়ে কি শিখ্‌লি তৃপ্তি? প্রাণের তেজের কাছে দেহের শক্তি কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে?

তৃপ্তি। তোমার মত জোর ত' আমার প্রাণে নেই দিদি! তোমার মত ভগবানের উপর সকল রকমে নির্ভর কর্‌তে এখনও আমি শিখিনি যে।

দীপ্তি। না শিখ্‌লে চল্‌বে কেন বোন? বাপ ভায়ের রক্ষিত গৃহে ত এখানে আসিনি যে, চুপ করে ব'সে থাক্‌লেই চল্‌বে। ভগবান যে শক্তিটুকু দিয়েছেন সমস্ত প্রয়োগ ক'রে আত্মরক্ষা কর্‌তে হ'বে। ভয়ে ভেঙ্গে পড়্‌লে ত ভগবানের দানের অবমাননা করা হয়। প্রাণটাকে একটু শক্ত ক'রে তোল, দেখি— বিপদ কেমন ক'রে-এসে ঘিরে দাঁড়ায়?

কুটীর-দ্বার বাহির হইতে বন্ধ ছিল। একটি বলিষ্ঠ লোক দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। কহিল, "বেলা অনেক হ'য়েছে। তোমরা স্নান ক'রে নেও। বাবুরও আস্‌বার সময় হ'ল।"

দীপ্তি। কোন্ বাবু আস্‌বে? কেন আমাদের এখানে নিয়ে এসেছ?

লোকটি কহিল, "অত খবরে কাজ কি? যে বাবু আস্‌বেন,

দেখ্‌লেই চিন্‌বে তাঁকে। তখনই বুঝ্‌বে কেন তোমাদের এখানে আনা হ'য়েছে ?

দীপ্তি। তুমি দোর বন্ধ ক'রে রাখ। আমাদের স্নান বা আহারের প্রয়োজন নেই।

লোকটি একটু তামাসার সুরে কহিল, "দু'দিন পরেই নয় হুকুম চালিয়ো বিবি সাহেব! এযে দেখ্‌ছি বিয়ে না হ'তেই ভাঁড়ার ঘরের চাবি হাতে নিতে চাও।"

লোকটার অভদ্রোচিত কথার ভঙ্গীতে দীপ্তির প্রাণটা ঘৃণায় বিরক্ত হইয়া উঠিল। একটু কঠোর স্বরে দীপ্তি তাহাকে স্থান ত্যাগ করিতে বলিল।

তৃপ্তি এ দৃশ্যে হৃদয়ের বলটুকু একেবারে হারাইয়া ফেলিল। সে দীপ্তির গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দীপ্তি কহিল, "তুমি সরে যাও বল্‌ছি, নইলে আমাদের আর জীবন্ত দেখ্‌তে পাবে না।"

লোকটা কহিল, "এ বয়সে, এত সহজে প্রাণের মায়াটা কাটান কি ভাল ?"

"তবে দেখ," বলিয়া দীপ্তি পরিহিত বস্ত্রাঞ্চল গলায় জড়াইয়া পাক দিতে লাগিল।

তৃপ্তি ক্ষিপ্রহস্তে দীপ্তির গলার কাপড় ধরিয়া বলিল,—"এ কি হচ্ছে দিদি! আমার ব্যবস্থা না ক'রে ত তুমি মর্‌তে পার্‌বে না।"

দীপ্তি একটু থামিয়া বলিল, "তবে দু'জনে এক সঙ্গেই মরি আয়।"

"সর্দ্দার, সর্দ্দার," বলিয়া লোকটা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

অমনি সঙ্গিগণের সহিত সর্দ্দার আসিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইল।

দীপ্তিকে দেখাইয়া পূর্ব্বের লোকটি কহিল, "দেখ্‌ছ সর্দ্দার, গলায় কাপড় জড়িয়ে মেয়ে দু'টো মর্‌তে চায়। কাপড় কেড়ে নিলে হয় না?"

সর্দ্দার কহিল, "থাম্ তুই।"

দীপ্তির দিকে চাহিয়া বলিল, "মর্‌বার এত গরজ কেন? দিন কত সুখভোগ করই না? তার পর সে কথা ভাব্‌লেই চল্‌বে।"

উপস্থিত লোকগুলির মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "সরে দাঁড়া সব—অই বাবু আস্‌ছে।"

গৃহদ্বারে একজন নবীন যুবকের আবির্ভাবে দীপ্তির শরীরটাও যেন কাঁপিয়া উঠিল।

সর্দ্দার কহিল, "এতক্ষণ ধরে খোসামোদ করেও এদের নাওয়াতে বা খাওয়াতে পারি নি। আপনি এখন দেখুন।"

যুবকের লালসাময় কলুষিত দৃষ্টিতে প্রথমে দীপ্তি বড়ই সঙ্কুচিতা হইয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, "চেহারায় আপনাকে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। আমাদের উপর এ অত্যাচারের কর্ত্তা যদি আপনি হ'য়ে থাকেন; তবে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি—কেন আমাদের এখানে এমন ভাবে নিয়ে এসেছেন?"

যুবক বলিলেন; "বিনা উদ্দেশ্যে তোমাদের এখানে নিয়ে আসি নি।"

সর্দ্দারকে কহিলেন, "তোমরা এখান থেকে যেত পার। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন বাইরে থেকে এ বাগানে না আসে।"

সদলে সর্দ্দার প্রস্থান করিলে যুবকটি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দীপ্তির দিকে চাহিয়া ধীর ভাবে বলিলেন, "তোমাদের প্রতি কোন অত্যাচার করা হ'বে না। তবে তোমার ছোট বোন্‌টিকে এখনি অন্যত্র পাঠাতে হ'বে। আমি লোক সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ কর্‌তে চেষ্টা করা আর অমঙ্গল বাড়িয়ে তোলা একই জিনিষ, এ কথা বোধ হয় বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছ।"

দীপ্তি দৃঢ়স্বরে কহিল, "আপনি কিছুতেই আমার ভগিনীটিকে অন্যত্র পাঠাতে পার্‌বেন না। আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন, রমণী মায়ের জাতি—"

যুবক। তোমার বক্তৃতা শুন্‌তে আমি আসিনি। ছাড় বল্‌ছি, না হয় ত তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমিই অন্যত্র যাব।

তৃপ্তি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

যুবক বলপ্রয়োগে দীপ্তির বাহুপাশ হইতে তৃপ্তিকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দীপ্তি বিপদের মাত্রাটা একবার ভাবিয়া লইল। ঊর্দ্ধনেত্রে প্রার্থনা করিল, "দুর্ব্বল নারী হৃদয়ের শক্তিগুলিকে একটু জাগিয়ে-দাও ভগবান - যে শক্তিতে জগৎ অনুপ্রাণিত আমরা ত সে শক্তিরই অংশ। আমাদের অপমানে যে সে মহাশক্তির অপমান হচ্ছে প্রভো!"

যুবকের দিকে চাহিয়া দীপ্তি বুঝিল, ইহার কাছে মুক্তির প্রার্থনা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। এ যে ভদ্র-বেশে নর-পিশাচ।

দীপ্তি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "সর্দ্দার—সর্দ্দার!"

পরক্ষণেই কয়েকজন লোকসহ সর্দ্দার দ্বারদেশে উপস্থিত হইল।

যুবক ধমক দিয়া কহিলেন, "কেন সব এখানে এলি? চলে যা' বল্‌ছি।"

দীপ্তি বাধা দিয়া কহিল, "না সর্দ্দার যেওনা। একবার ভাল করে আমাদের দিকে চেয়ে দেখ সর্দ্দার: আর একবার সেই সঙ্গে তোমার মায়ের কথা মনে কর। আমাদের শরীরে যা' কিছু লালসার সামগ্রী দেখ্‌ছো—তোমার মায়ের শরীরে ও ঠিক তাই আছে। একবার তোমার জন্মের কথা মনে কর, শিশুকালে কেমন ক'রে জীবন ধারণ করেছিলি সে কথা একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখ—তারপর যদি কলুষিত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইতে পারো তবে বুঝ্‌বো, মা ছেলের সম্বন্ধ নেই, জগতের সহিত ভগবানের সংশ্রব ছিন্ন হ'য়েছে।"

দীপ্তির নয়নে বদনে যেন এক্‌টা অপূর্ব্ব প্রভা ফুটিয়া উঠিল। সর্দ্দার ও তাহার সঙ্গিগণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দীপ্তি বলিতে লাগিল, "আমরা রমণী, তোমার মায়েরই জাতি, সর্দ্দার! একবার হৃদয়ের মধ্যে মাতৃমুর্ত্তির কল্পনা কর—তোমার ভগিনী—তোমার কন্যার কথা স্মরণ-পথে নিয়ে এসো। তাদের শরীরে যা' আছে,—তা' দেখে ত কুৎসিৎ বাসনা তোমার প্রাণে

জেগে ওঠে না। তবে সর্দ্দার, এই আমরা তোমার কাছে এগিয়ে দাঁড়াচ্ছি। পার যদি কাছে এসো, আমাদের উপর অত্যাচার করতে তোমার হাত ওঠে কি না একবার দেখি!"

মুগ্ধ সর্দ্দার দীপ্তির পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। বলিল, "মা—মা! রক্ষা কর মা! তোর অই মূর্ত্তি যে আমার বহুদিনের হারানো মায়ের মুখখানা মনে করিয়ে দিচ্ছে, মা!"

যুবক ক্রুদ্ধ-স্বরে কহিলেন, "এ বড় বেয়াদপি হ'চ্ছে সর্দ্দার, এর শাস্তি কি জান?"

সর্দ্দার স্থির দৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া কহিল, "শাস্তির কথা কি বলছেন বাবু? শাস্তির ভয়ে কেউ কখনো মায়ের অপমান হ'তে দেয়?"

দীপ্তিকে কহিল, "কোন ভয় নেই মা! আমরা এখানে যতগুলি লোক আছি সব তোর সন্তান। আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে তোদের রক্ষা ক'রবো।"

এমন সময় বহুলোক একত্রে সেই বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল।

গৃহমধ্যে—দীপ্তি তৃপ্তিকে দেখিয়া উত্তেজিত রতন বলিয়া উঠিল, "আর ভয় নেই।"

সর্দ্দারকে দেখিয়া বলিল, "কিরে ভীমে, আমার দিদিমণিদের চুরি ক'রে এনেছিস্—এখন তোর মাথা বাঁচা।"

রতনের প্রকাণ্ড যষ্টি ভীমসর্দ্দারের মাথায় পড়িতেছিল।

দীপ্তি অগ্রসর হইয়া একহস্তে সে যষ্টি ধারণ করিয়া বলিল,

"থাম্ রতন, সর্দ্দার যে আমার সন্তান। আমাদের মান্ রক্ষা করেছে বলে এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্।"

রতন পার্শ্বে দণ্ডায়মান যুবকটিকে দেখিয়া বলিল, "এই যে আমাদের ম্যানেজার সাহেব! আয় তো তোরা সব্ এদিকে একবার, ম্যানেজার সাহেবকে একটু সম্মান দেখানো যাক্।"

রতন চাষা অভদ্র। মিঃ হীরালালকে সেই ভাবেই সম্বর্দ্ধনা করিতে করিতে গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিল।

৪০

হুগ্‌লীতে আসিয়া মিঃ মুখার্জ্জির সাহায্যে শচীন ও অনিল বিজয়বাবুর মোকদ্দমার অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। শচীনের অক্লান্ত পরিশ্রম, মিঃ মুখার্জ্জির ঐকান্তিক চেষ্টা সফল হইল। বিজয়বাবু মোকদ্দমায় খালাস পাইলেন। এ জয়লাভে পিতা-পুত্রের মিলনটা বড়ই মধুর হইয়া উঠিল।

বিজয়বাবু শচীনকে ডাকিয়া কহিলেন, "চল এখন সকলে মিলে বাড়ী যাই। মিঃ মুখার্জ্জি যদি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন তবে বড়ই ভাল হয়। তোমরা একবার তাঁ'র মতটা জেনে এসো। তারপর আমি নিজে যাব।"

শচীন। মিঃ মুখার্জ্জির যাওয়ার ত কোন বাধা দেখিনা। ব্যবসার উপলক্ষে তিনি কোন স্থানেই থাকেন না। ভগবানের কৃপায় অর্থের তাঁর অভাব নাই। পিতৃদত্ত বিপুল অর্থে তিনি ইচ্ছা কর্‌লে একটা বড় জমিদারী ক্রয় কর্‌তে পারেন। চিকিৎসক তিনি; কিন্তু চিকিৎসা ক'রে অর্থোপার্জ্জন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। আমি তাঁ'র সংকল্প জানি। এ দরিদ্র দেশে যা'তে লোকে রোগের সময় সুচিকিৎসকের সাহায্য পে'তে পারে, সে জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে পঁচিশটি চিকিৎসালয় স্থাপন কর্‌বেন এবং চিকিৎসালয়গুলির পরিচালনের ব্যয় ভার তিনি নিজেই বহন কর্‌বেন। তাঁ'র এই সাধু সংকল্প কার্য্যে পরিণত হ'লে দেশবাসীর

যে কত বড় একটা উপকার হ'বে তা' সহজেই অনুমান করা যায়। আমি অনিলকে সঙ্গে নিয়ে এখনি মিঃ মুখার্জ্জির কাছে যাচ্ছি। বোধ হয় তিনি রাজি হবেন।

শচীন চলিয়া গেলে মিঃ মুখার্জ্জির মহত্বের কথা বিজয়বাবুর সমস্ত প্রাণখানি অধিকার করিয়া ফেলিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এমন ভাবে যাহারা দেশের কাজে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন, দেশের কল্যাণের কাছে—যাঁহারা অকাতরে আত্ম বিলাস-বাসনা, আত্ম-সুখ-সম্ভোগ বলিদান করেন, সেই দেশমাতার প্রিয় সন্তান-গুলি কিনা সমাজচ্যুত! আর যাঁহারা দেশবাসীর রক্ত শোষণ করিয়া অর্থশালী—যাঁহাদের অর্থ দেশবাসীকে পীড়ন করিয়া নিত্য নূতন অপরাধ-বৃক্ষ রোপন করে, তাঁহারাই সমাজের মেরুদণ্ড —তাঁহারাই সমাজের বিধাতা-পুরুষ!

বিজয়বাবু মনে মনে স্থির করিলেন যে, একবার প্রাণপণ চেষ্টায় এ প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

শচীন ও অনিল যখন মিঃ মুখার্জ্জির বাড়ীতে গেল তখন লীলা পিয়ানোর সহিত গাহিতেছিল,—

পথহারা পথিকের সাথী
আলো তুমি আঁধারের মাঝে।
মহিমা তব জাগিছে প্রাণে
পুলকে নিত্য নবীন সাজে।
না চাহিতে তুমি দিতেছ করুণা
স্নেহ প্রেম দয়া ঢালিয়া।

সমীর সাগরে, ভূধর কাননে
জ্যোতির কিরণে আঁকিয়া।
মম তাপিত প্রাণ লহ প্রভু তুলে
তব যুগল পদ সরোজে।

এ প্রাণ-ঢালা সঙ্গীতের ছন্দে, গায়িকার তন্ময়তায় শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীত শেষে—শচীন ও অনিলের প্রতি মিঃ মুখার্জ্জির দৃষ্টি পড়িল। তিনি কহিলেন, "একধারে এমন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন বল ত? তোমরা এসেছ তা'ত টেরই পাইনি।"

সম্মুখের আসনে উপবিষ্ট হইয়া শচীন কহিল, "এ গানের স্বর যে প্রাণের মধ্যে একটা গভীর রেখা অঙ্কিত ক'রে দেয় ডাক্তার সাহেব! গান শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা যে আর সব কথা ভুলে গিয়েছিলাম!"

অনিল কহিল, "শুন্‌বো মনে ক'রে আমি কোন দিন গান শুনি নাই। গান যে এত মিষ্টি হ'তে পারে আমি পূর্ব্বে কখনও তা' ভাবি নি। শুনেছি বউদি'ও নাকি খুব ভাল গাইতে পারেন। চলুন না, ডাক্তার সাহেব, এদের সব নিয়ে একবার আমাদের বাড়ীতে। বাবাও বিশেষ ক'রে বল্‌বার জন্য আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। বাড়ী গিয়ে কয়েকদিনের জন্য বউদি'র ছাত্র হ'ব।"

বেলা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আমাকে ছেড়ে একটু লীলার খোসামোদ কর। সঙ্গীত জিনিষটা ঠিক শিখ্‌তে পার্‌বে।"

লীলার সুন্দর মুখখানি লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কহিল, "বউদি' হচ্ছেন পাকা গাইয়ে, প্রার্থনার গানগুলি যে ওর মুখে কত মধুর লাগে তা না শুন্‌লে বোঝা যায় না।"

অনিল আগ্রহের সহিত কহিল, "তবে ত তোমার গাইতেই হচ্ছে বউদি'। ছাত্র যখন হ'বই তখন একবার পরখ ক'রে নেওয়াটাই বা মন্দ কি!"

মিঃ মুখার্জ্জি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ছেড়ো না অনিল! আমার ছোট বোনটিকে ছেলে মানুষ পেয়ে কেবলই খাটিয়ে মারেন। গানের ভার সব এই লীলার উপরেই সঁপে দিয়েছেন। নিজে যেন কিছুই জানেন না।"

বেলা। ভগবানের নাম নিয়ে দু'একটা গান গাইবার খাটুনি যেন লীলাকে মেরে ফেল্‌ছে আর কি!

"তা' যাই হউক বউদি', তুমি একটা গাও", বলিয়া অনিল বেলার হাত ধরিয়া তাঁহাকে পিয়ানোর দিকে লইয়া চলিল।

লীলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

যখন সকলেই একবাক্যে জেদ্‌ করিয়া বসিল, তখন বেলার আর অন্য উপায় রহিল না! তিনি কহিলেন, "লীলার পরে আমার গান তোমাদের ভাল লাগ্‌বে না, এ কথা কিন্তু আমি আগেই ব'লে রাখ্‌ছি।"

লীলা কহিল, "তোমার মুখে ভগবানের নাম চিরদিনই বড় মিষ্টি।"

বেলা গাহিলেন,—

তোমার চরণে দিয়েছি হে প্রভু,
সারাটি জীবন ঢালিয়া।
পরাণ আমার হাসিছে হরষে
তোমার মাধুরী মাখিয়া।

জগত জুড়িয়া আছে তব ছবি
ছায়াটুকু তা'র শশী তারা রবি
অবোধ হৃদয় বোঝে নাকো কিছু
রাখহে চরণে তুলিয়া।

পদে পদে ভুল হই দিশে-হারা
তুমি দাও প্রভু, করুণার ধারা,
হৃদয়ের পাপ দূর কর তুমি
অভয় চরণে রাখিয়া।

গান সমাপ্ত হইলে শচীন ভাবিতে লাগিল—বালক বালিকার মত সরল প্রাণ নিয়ে এঁরা সংসারের কুটীল পথটাকে কেমন সুন্দর করে রেখেছেন।

অনিল কহিল, "তোমার ছাত্র হ'লে আমার অপমান হ'বে না বউদি'। এখন শেখাতে পারলে হয়। কই ডাক্তারসাহেব, আমার কথার ত উত্তর দিলেন না। বাবা যে আমাদের আপনার মত জান্‌বার জন্ম পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

মিঃ মুখার্জ্জি। তোমরা কবে বাড়ী যাচ্ছ অনিল ?

অনিল। আমরা সব সময়েই তৈরি আছি। আপনি কখন যেতে পারবেন, বলুন।

মিঃ মুখার্জ্জি বেলা ও লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনিলের এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তোমাদের কোন আপত্তি আছে কি?"

বেলা কহিলেন, "অনিল যখন আমার ছাত্র হ'বে, আর লীলাকেও যখন এ কাজে সাহায্য করতে হ'বে, তখন এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ত আমাদের কোন আপত্তি থাকতেই পারে না।"

মিঃ মুখার্জ্জি। তবে রওনা হ'বার ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে আমাদের কাছে খবর পাঠিয়ো। আমরা ঠিক তৈরি হ'য়ে থাকবো।

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ জানাইল, একজন ভদ্রলোক ডাক্তারসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছেন।

ডাক্তারসাহেব সকলকে বসিতে বলিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলেন যে উৎকণ্ঠিত ভাবে বিজয়বাবু তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। মিঃ মুখার্জ্জিকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বড়ই একটা দুঃসংবাদ ডাক্তারসাহেব! এই চিঠিখানা পড়ুন।"

বিজয়বাবু হেমলতার প্রেরিত বরেনের পত্রখানি ডাক্তার সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন।

পত্র পড়িয়া ডাক্তারসাহেব কহিলেন, "ব্যাপারটা যে বড়ই গুরুতর বিজয়বাবু! এখানে আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নাই। চলুন এখনি নন্দনপুরের দিকে রওনা হওয়া যাক্। এত বড় দুঃসংবাদটা শচীনকে হঠাৎ জানতে দেওয়া ঠিক

হ'বে না। আমি সময় মত তা'কে জানাব। আপনি বাড়ী গিয়ে সব ঠিক ক'রে ফেলুন। আমি সকলকে নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে আপনার কাছে যাব।"

"আচ্ছা, তাই হউক", বলিয়া বিজয়বাবু প্রস্থান করিলেন।

৪১

দীপ্তি, তৃপ্তিকে লইয়া সদলে রতন যখন নন্দনপুরে প্রবেশ করিল তখন সমস্ত গ্রামখানির মধ্যে যেন একটা বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই দেখিল রতনের দল ম্যানেজার হীরালালকে বাঁধিয়া আনিয়াছে।

রতনের উগ্রমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া এ দুঃসাহসিক কার্য্যের কেহ প্রতিবাদ করিল না সত্য, কিন্তু সকলেই বুঝিল যে রতনের অদৃষ্টে অশেষ লাঞ্ছনা আছে।

দীপ্তি ও তৃপ্তিকে আচার্য্যের সম্মুখে রাখিয়া যখন রতন নত-মস্তকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল, তখন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া আচার্য্য কহিলেন, "ফিরে এলি রতন!" আর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

রতন কহিল, "দিদিমণিদের গৌরবের সহিতই ফিরিয়ে এনেছি ঠাকুর! এখন একবার প্রতিশোধের রকমটা দেখুন।"

বদ্ধাবস্থায় মিঃ হীরালাল সেই স্থানে আনীত হইয়া-ছিলেন। রতন তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া কহিল, "পাজির পা ঝাড়া, বেহদ্দ বেহায়া, তোকে লাথি মারতেও যে লজ্জা হয় রে কুকুর!"

আচার্য্য মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "কি করিস্ রতন? এর বাঁধন খুলে দে বাবা!"

রতন। ওকে ছোঁবেন না ঠাকুর। নর্দ্দমার চেয়েও যে ওর দেহ অপবিত্র।

আচার্য্য নিজহস্তে হীরালালকে বন্ধন-মুক্ত করিলেন। বলিলেন, "যাও বাবা, গৃহে যাও। ভগবান তোমাকে সুমতি প্রদান করুন। দেখ্‌লে ত যাদের ভগবান রক্ষা করেন, তোমার আমার মত মানুষ তাদের কোন অনিষ্টই ক'র্‌তে পারে না।"

লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে মিঃ হীরালাল যেন একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া গেলেন। কোন উত্তর না করিয়া তিনি নিঃশব্দে আচার্য্যের কুটীর পরিত্যাগ করিলেন।

দীপ্তির প্রতি চাহিয়া আচার্য্য বলিলেন, "তোদের দিকে চেয়েই যে বুঝেছি মা, আমার দেব পূজার ফুলদুটিকে, দেবতার চরণে অঞ্জলিরূপে অর্পিত হওয়ার যোগ্য পবিত্র ভাবেই ফিরিয়ে পেয়েছি।"

দীপ্তি কহিল, "এ অগ্নি-পরীক্ষায় আমাদেরই জয়লাভ হ'য়েছে। ভগবানের অনুগ্রহ আর আপনার আশীর্ব্বাদ যে দুর্ভেদ্য বর্ম্মের ন্যায় আমাদের দেহ মনকে ঢেকে রেখেছে বাবা!"

সমাজের মাথা গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া সেখানে দাঁড়াইলেন।

তন্মধ্যে একজন কহিলেন, "মেয়েগুলো চিরদিনকার শত্রু। এ বৃদ্ধ বয়সে আচার্য্যকে কি যন্ত্রণাই না ভোগ ক'র্‌তে হচ্ছে!"

আর একজন কহিলেন, "শত্রু বলে শত্রু—এদের নিয়ে মান ইজ্জত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম বজায় রেখে চলা অসম্ভব।"

কাশী বাচস্পতি কহিলেন, "মেয়ে দুটোর এখন কি ব্যবস্থা ক'র্‌বে, আচার্য্য দাদা? তুমি সৎ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণোচিত ব্যবহারই যে আমরা সকলে তোমার কাছে আশা করি।"

প্রথম বর্ণিত লোকটি আবার বলিলেন, "আমি গোড়া থেকেই বলে আস্‌ছি, এত বয়েস পর্য্যন্ত ছোট মেয়েটাকে অবিবাহিতা রেখো না আচার্য্য! এখন যে এ মেয়ে নিয়ে কি উপায় ক'র্‌বে, তা' তো ভেবেই পাচ্ছি না।"

এমন সময় বিজয়বাবু ও মিঃ মুখার্জ্জি শচীন ও অনিলের সহিত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনিল আচার্য্যের পদধূলি লইয়া বলিল, "তবে সব বিপদের কথা সত্য নয়?"

কাশী বাচস্পতি অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "তা' নয় হে বাপু! ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অপহৃতা বিধবা ও কুমারী কন্যার প্রত্যাবর্ত্তন—বিষয়টা বড়ই গুরুতর। সে সম্বন্ধে একটা শেষ সিদ্ধান্ত কর্‌বার জন্যই ত আমরা এখানে এসেছি।"

রতন এতক্ষণ চুপ করিয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিল। সে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল, "শেষ সিদ্ধান্ত কর্‌বার জন্য কে আপনাদের এখানে ডেকে এনেছে বলুন ত?"

বাচস্পতি। ডাক্‌বে আবার কে? এ যে আমাদেরই দেখে শুনে ক'র্‌তে হ'বে।

রতন ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "অর্থাৎ মানুষ একটা বিপদের হাতে কোন রকমে পরিত্রাণ পেলেই, তার ঘাড়ে আর একটা বিপদের

বোঝা না চাপিয়ে আপনারা স্থির থাকৃতে পারবেন না—এই ত ?"

বাচস্পতি বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "এ ছোট লোক বেটার সাহস ত কম নয়। মুখের উপরই আমাদের গালাগালি দিচ্ছে। বেটা ব্রাহ্মণ মানে না।"

রতন কহিল, "এত বড় মিথ্যা কথাটা বলো না ঠাকুর! ব্রাহ্মণ আমাদের মাথার মাণিক। কিন্তু যা'রা গাছকত স্থতো গলায় ঝুলিয়ে আসল ব্রাহ্মণের সমস্ত সম্মানের দাবী করে, তাদের আমরা মানি না। তোমরাও ত সেই দলের লোক বলেই মনে হচ্ছে। আমার দিদিমণিরা এত পবিত্র যে তা'রা তোমাদের বিচারের সীমার অনেক উপরে। আর যে অবস্থায় দিদিমণিরা পড়েছিল যদিই বা তাদের উপর কোন অত্যাচার হ'তো—সেজন্ত ত তা'রা দায়ী নয়। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজের জন্ত—তাদের শাস্তিরই যে বিধান হ'তে পারে না।"

বাচস্পতি। গোল্লায় যা' মূর্খ বেটা! অনিচ্ছায় আগুনে হাত দিলে কি আগুন ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়, না হাত পোড়ায় ?

রতন। দেখ ঠাকুর, অনিচ্ছায়ও যখন কাজের ফল ফলে বলেই স্বীকার কচ্ছ, তখন আমিও হয়ত অনিচ্ছায় এমন একটা কিছু করে ফেল্‌বো, যা'তে কাঁধের উপর তোমাদের মাথাগুলো আর স্থান পাবে না।

রতনের রুদ্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মণগণের প্রাণে ভয়ের উদ্রেক করিয়া

দিল। তাঁহারা অবোধ্য ভাষায় অভিশম্পাত করিতে করিতে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।

ধীরভাবে শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি রতন?"

রতন। সমস্তই যোগেশবাবুর অপরাধ বৃক্ষের ডাল-পালা। শ্যালককে তিনি ম্যানেজার নিযুক্ত করেছেন। সে মহাপ্রভু ত চিরদিনই আপনাদের উপর চটা। আপনারা কাছে নেই, এ সুযোগে তিনি ভীমে সর্দ্দারের সাহায্য নিয়ে—দিদিমণিদের চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। চেয়ে দেখুন, অই ভীমে সর্দ্দার এখনও মা—মা ক'রে দিদিমণিদের পায়ের তলায় লোটাচ্ছে। ভগবানের কৃপায় দিদিমণিদের কোনই অনিষ্ট হয়নি। কিন্তু দাদা ঠাকুর, আর এখানে নয়। আপনারা আগে যান, আমরা কিছু পরে যাচ্ছি। কখনও যদি ভগবানের ইচ্ছায় আবার শুভদিনের উদয় হয়, তবেই ফিরে এসে এ গ্রামে আমরা ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌বো।

অনিল কহিল, "আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন জ্বলে যাচ্ছে, রতন! কি করি বল ত?"

আচার্য্য। স্থির হও অনিল। ভগবানের নামেই সমস্ত যন্ত্রণার শান্তি হয়।

রতন। ঠাকুরের ভগবান যদি সকলের প্রাণে সমানভাবে এসে দেখা দিতো, তবে বোধ হয় ক্রোধ বলে জিনিষটা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যে'তো।

আচার্য্য। বিজয়বাবু, ডাক্তারসাহেব সব দাঁড়িয়ে আছেন যে রতন! এদের বস্‌তে দেও।

মিঃ মুখার্জ্জি। আপনি ব্যস্ত হ'বেন না।

বিজয়বাবু। আমরা আজ আপনার এখানেই প্রসাদ পাব।

আচার্য্য। প্রসাদে অধিকার সকলেরই সমান।

রতন। আমরাও তবে বাদ্ পড়্ছি না। যাও দিদিমণিরা। এখন তবে আর বসে থাক্বার সময় নেই।

মিঃ মুখার্জ্জি। অনেক ব্রাহ্মণের চেয়ে এ কৃষকসন্তান রতনকে যে অধিকতর উচ্চ আসন দিতে ইচ্ছা হয় বিজয়বাবু!

৪২

লাঞ্ছিত হীরালাল অশ্রুসিক্ত নয়নে বিন্দুরাণীর কাছে আসিয়া বলিলেন, "এমন ক'রে অপমানিত ক'র্‌বার জন্যই কি আমাকে ম্যানেজার নিযুক্ত ক'রেছিলে দিদি ?"

বিন্দুরাণী অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, "একি চেহারা তোমার হীরালাল ! কি হয়েছে ?"

হীরালাল। জানই ত দিদি, যা'রা সব আচার্য্যের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, তাঁর মেয়ে দু'টীকে চুরি করে পালিয়েছিল, আমি তা'দের ধর্‌বার জন্য চেষ্টা কচ্ছি। অনুসন্ধানে জান্‌তে পেরেছিলাম, কোন্‌খানে তা'দের আটক রাখা হ'য়েছে। ভদ্রলোকের মেয়ে দু'টীকে উদ্ধার ক'র্‌বার জন্য প্রাণটা অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো। কাজেই তিলমাত্র দেরী না ক'রে, ঘোড়া ছুটিয়ে আমি সেখানে গিয়ে হাজির হই। এখন দেখ্‌ছি বাড়ীতে আগুন—মেয়ে চুরি—সব মিছে, কেবল আমাদের জব্দ ক'র্‌বার একটা ষড়যন্ত্রমাত্র। রত্‌না বেটারই সব কল-কৌশল। আমি ভাল ভেবে গেলাম মেয়ে দু'টোকে বাঁচাতে, এখন কিনা সবাই মিলে আমার কাঁধেই মেয়ে চুরির অপরাধটা চাপিয়ে যা' খুসী তাই ক'রে আমাকে অপমান ক'র্‌লে ! এ দেশে মুখ দেখানো যে আমার অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌লো।

বিন্দু। বাবু কি এ সব কথা শুনেছেন ?

হীরালাল। শুনেছেন কিনা জানি না।

বিন্দু। আচ্ছা, আমি এখনি তাঁ'কে ডেকে-পাঠাচ্ছি।

বিন্দুরাণী একজন ঝিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, বিশেষ একটা জরুরী কাজের জন্ম বাবুকে যেন এখনি একবার অন্দরে আসতে সংবাদ দেওয়া হয়।

হীরালাল বলিতে লাগিল, "সব এসে আবার নন্দনপুরে জুটেছেন। শচীন, অনিল, ডাক্তারসাহেব, বিজয়বাবু—সকলে মিলে একটা আকাশ পাতাল জোড়া গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি ক'রে আমাদের বিপদে ফেল্‌বার চেষ্টায় ছিলেন। আজ তাঁ'দের সে মত্‌লব অনেকটা সিদ্ধ হয়েছে।"

বিন্দু। তোমরা কি সব চোখ বুজে ছিলে?

হীরালাল। একসঙ্গে যখন সব নন্দনপুর ছেড়ে চলে যায়, তখনই আমার প্রাণে একটা সন্দেহের ছায়া পড়েছিল। কিন্তু ব্যাপার যে এতদূর গড়াবে তা' আমি ভাব্‌তে পারি নাই।

বিন্দু। বাবু এলে, এর একটা বিহিত করাই-চাই।

হীরালাল। মান যা' গেছে তা' আর ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না দিদি! তার চেয়ে বরং আমায় বিদায় দেও।

বিন্দু। নন্দনপুর জমিদার বাড়ী কি এতই হীনবল হ'য়ে পড়েছে যে, তোমার প্রতি অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে চুপ করে থাক্‌বে? একবার দেখই না? তারপর তোমার যা' খুসী ক'রো।

অদূরে যোগেশবাবুকে আসিতে দেখিয়া হীরালাল কহিলেন,

"বাবুর কাছে আমি কিছু ব'ল্‌তে পার্‌বো না। তুমিই যা' হয় ব'লো দিদি।"

বিন্দুরাণী কহিলেন, "আমিই বাবুকে সব বল্‌ছি।"

যোগেশবাবু গৃহে প্রবেশ করিতেই বিন্দুরাণী অলঙ্কারের সহিত মিঃ হীরালালের লাঞ্ছনার ইতিহাস বর্ণনা করিলেন।

আচার্য্যপরিবারের উপর যোগেশবাবুর বিদ্বেষ এতই প্রবল ছিল যে, তিনি বিন্দুরাণীর বর্ণিত-কাহিনী সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন এবং ক্রোধের আবেগে প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রাণপণ শক্তি-প্রয়োগে এ ব্যাপারের প্রতিবিধান করিবেন।

ধীর পদবিক্ষেপে বরেন আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। বলিল, "এ প্রতিজ্ঞা কেন বাবা? নিরপরাধ লোকের প্রতি এ অত্যাচারে যে পৃথিবী কেঁপে উঠ্‌ছে। ভগবানের দোহাই দিয়ে বল্‌ছি বাবা, আপনি শান্তচিত্তে একবার সকল ঘটনাটা ভেবে দেখুন। আমি জোর করে বল্‌ছি, প্রথম থেকেই আপনি ভুল ধারণায় কাজ করে যাচ্ছেন।"

যোগেশ। তুমি কি বল্‌তে চাও বরেন?

বরেন। দেবতার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে। আবার এখন সেই দেব-চরিত্রে ষড়যন্ত্রের কালিমালেপন ক'রে, তাঁকে নূতন বিপদে ফেল্‌বার আয়োজন থেকে নিবৃত্ত হউন বাবা! ধর্ম্ম যে এ পাপের ভারে অধৈর্য্য হ'য়ে উঠ্‌লো।

হীরালাল। তুমি কি মনে কর, আমরা যা' কিছু ক'রে যাচ্ছি সবই অন্যায়?

বরেন। মামাবাবু—মামাবাবু—মিনতি করে বল্‌ছি, আপনি আমার প্রাণের তারগুলিকে আর বাজিয়ে তুল্‌বেন না। বোধ হয় তা' হলে আমার ধৈর্য্যের সীমা আর রাখ্‌তে পার্‌বো না।

হীরালাল। বাহিরের লোকে আমায় যে অপমান কচ্ছে, এখন দেখ্‌ছি তুমি সে অপমানটা আরও বাড়িয়ে তুল্‌ছো বরেন!

বরেন। কি অপমান আপনার হ'য়েছে মামাবাবু? জগতে এমন কি শাস্তি আছে যা' আপনার অনুষ্ঠিত নৃশংস কার্য্যের উপ-যুক্ত হ'তে পারে? আপনার যদি কোন দেবতা থাকে, যদি কোন ধর্ম্মে আপনার আস্থা থাকে, তবে তার দোহাই দিয়ে বল্‌ছি মামাবাবু, প্রাণের গতিটা ফিরিয়ে দিন—যা' করেছেন তার জন্য আচার্য্যঠাকুরের পায়ের উপর গিয়ে পড়ুন। দেখ্‌বেন সে দেবতা সব ভুলে আপনাকে কোলে তুলে নিবেন।

বিন্দুরাণীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "মা—মা, মামাবাবুকে একটু বুঝিয়ে বল। নিজের অপরাধ গোপন ক'রে, সে অপরাধ আর একজনের কাঁধে চাপিয়ে মিথ্যা উৎপীড়নের সৃষ্টি আর হতে দিওনা।"

যোগেশবাবু ধমক দিয়া কহিলেন, "এ সব কি পাগ্‌লামি হচ্ছে বরেন?"

বরেন। এখনও পাগল হইনি বাবা! কিন্তু পাগল হ'তে বোধ হয় আর বেশী দেরী নেই! আপনার যা' অভিরুচি করুন। আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে চল্লুম। আমার প্রায়শ্চিত্তে যদি আপনাদের কলঙ্ক মুছে যায়, তবেই আমি ফিরে আস্‌বো।

এখানে দাঁড়িয়ে অক্ষমের ন্যায় এ দৃশ্যের অভিনয় দেখ্‌লে আমার চক্ষু অন্ধ হ'য়ে যাবে।

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বরেন সেই গৃহ ত্যাগ করিল।

বিন্দুরাণী কহিলেন, "সত্যিই বরেন চলে গেল যে হীরালাল! একবার ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।"

হীরালাল যাইতেছিলেন। বাধা দিয়া যোগেশবাবু বলিলেন, "দাঁড়াও হীরালাল।"

যোগেশবাবুর কঠোর দৃষ্টি হীরালালের প্রতি স্থাপিত হইল। তিনি বলিলেন, "আজ আর আমি বরেনের কথা উপেক্ষা কর্‌তে পাচ্ছি না। বরেনের কথার মধ্যে আজ যেন একটা প্রকাণ্ড সত্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—দৃষ্টি সে দিকে না পড়েই পারে না। আমার মনে হচ্ছে, বাস্তবিকই যেন আমরা ভুল পথে চল্‌ছি। আমি সত্য কথা শুন্‌তে চাই হীরালাল! আচার্য্যের গৃহ-দাহ ও কন্যা অপহরণে তুমি জড়িত আছ কি না?"

হীরালালের মুখখানি শুকাইয়া গেল।

যোগেশবাবু হীরালালের মুখের প্রতি চাহিয়া বিস্মিত হইলেন। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে অবস্থান করিয়া বলিলেন, "ছেলে আমার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে গেছে—একলা তার প্রায়শ্চিত্তে কাজ হ'বে না। আমাকেও সে প্রায়শ্চিত্তের অংশ নিতে হ'বে।"

বিন্দুরাণী কহিলেন, "এত অস্থির হ'লে ত সব দিক মাটি হ'বে।"

যোগেশ। অস্থির আমি এখন মোটেই না। এতদিন যে

অস্থিরতার পরিচয় দিয়েছি, বরেনের কথায়, হীরালালের নীরবতায় সে অস্থিরতা ত আর নাই। বিদ্বেষ বুদ্ধির প্রভাবে যে বিচার শক্তির পরিচালনা করি নাই বরেনের কথায় যেন সে শক্তি ব্যবহার কর্‌বার জন্য অধীর হ'য়ে উঠেছি। আমার এ অধীর ভাব সম্পূর্ণ পৃথক রকমের। আমি এখন চল্লুম।

যোগেশবাবু প্রস্থান করিলেন।

বিন্দুরাণী একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। বলিলেন, "এ সব কি শুন্‌ছি হীরালাল!"

হীরালাল কেবল উত্তর করিলেন, "আমাকে বিদায় দেও দিদি।"

বিন্দুরাণী যেন আর এক রকম হইয়া গেলেন। বলিলেন, "অতি উচ্চ পর্ব্বতের চূড়া থেকে তুমি যে একেবারে পায়ের তলায় পড়ে গেলে। কি ভুল ধারণাই এতদিন আমাদের ছিল! তুমি ভাই, তোমাকে আর বেশী কি বল্‌বো! তুমিই বুঝ্‌তে পার, এর পর তোমার কি করা কর্ত্তব্য।"

"তা' বুঝি দিদি!" বলিয়া হীরালাল প্রস্থান করিলেন।

৪৩

যোগেশবাবু যেন কেমন হইয়া গেলেন। পথে চলিতে চলিতে কোন অনিবার্য্য কারণে পথিকের গতিরুদ্ধ হইলে সে যেমন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়, যোগেশবাবুও তেমনি তাঁহার গন্তব্য পথের মধ্য-ভাগে বাধা পাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। যে বিষয়টা এতদিন নিতান্ত সরল বলিয়া বিশ্বাস ছিল একটু গভীর চিন্তার পর যেন তাহা অন্যরূপ বোধ হইতে লাগিল। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলেন তাহাই যেন একটা দুরপণেয় কলঙ্কের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে এতদিন যে একটা অভিমানের ভাব লুক্কায়িত ছিল, আজ যেন অতি স্পষ্টরূপে তাহা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

উপেক্ষায় ও সহিষ্ণুতায় আচার্য্য যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহার কাছে—অর্থের অহঙ্কার ও ক্ষমতার অহঙ্কার, অর্থ ও ক্ষমতাকে নিতান্ত ছোট বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিল। যোগেশ বাবুর এ পরিবর্ত্তন বিন্দুরাণীর প্রাণেও একটা নূতন ভাব জাগাইয়া দিল। তিনি এখন বেশ বুঝিলেন যে, ভ্রাতার পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া যাহা কিছু করিয়াছেন সে সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই যেন দোষ রহিয়া গিয়াছে। তিনি যোগেশবাবুকে বলিলেন, "এতদিন তবে আমরা বড়ই অন্যায় ক'রে এসেছি ?"

ধীরভাবে যোগেশবাবু কহিলেন, "ভাল করে না ভেবে কাজ কর্‌লে, মানুষকে এমনি ভাবেই অপদস্থ হ'তে হয়। এতদিন আমরা কেবল নিজেদের দিকে চেয়েই চলে এসেছি। কাজেই অন্যায় না হ'য়ে তা' আর ন্যায় কেমন ক'রে হ'বে? সামান্য একটু মান অভিমান বজায় রাখ্‌তে গিয়ে, কত বড় একটা অপরাধের বোঝা সে কাঁধে তুলে নিয়েছি, তা' এখনও তুমি ভাল ক'রে বোঝ নি। আমি রতনকে আস্‌তে খবর পাঠিয়েছি। সে এলে পাশের ঘর থেকে শুনো সে কি বলে।"

বিন্দু। হীরালালের কি হবে?

যোগেশ। কি আর তা'র হ'বে? তা'কে আবার বিলেত পাঠিয়ে দেও। যাবার সময় ভাল ক'রে বলে দিও, এবার যেন বেশ ক'রে দেখে আসে বিলেতের লোক নিজের দেশের লোককে কেমন ভালবাসে! দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য কেমন তা'রা অকাতরে প্রাণ সমর্পণ করে। ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতি না চেয়ে আত্ম-ত্যাগের কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সেখানে নিত্য বিরাজ করে? এ কথা এতদিন আমিও ভাব্‌তে শিখি নাই। কিন্তু এ কয়েকদিন আচার্য্য ও শচীনের কথা মনে ক'রে এ শিক্ষা যে প্রাণের মধ্যে আপনি এসে জুড়ে বসেছে!

বিন্দু। আবার এ'তে ঢের খরচ হ'বে যে?

যোগেশ। প্রথম বারের খরচটাকে একেবারে বৃথা না মনে কর্‌বার জন্য, আবার নয় কিছু খরচ হোক। একটুও মনুষ্যত্ব

াভ ক'রে যদি হীরালাল ফিরে আসে—তবে সব খরচই আমাদের সার্থক হ'বে।

এমন সময় একজন ভৃত্য সংবাদ জানাইল যে, রতন বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

যোগেশবাবু রতনকে আনিবার জন্ম আদেশ দিয়া বিন্দু রাণীকে কহিলেন, "তুমি একটু পাশের ঘরে যাও। রতনের সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।"

বিন্দুরাণী পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিলেন। একটু পরেই রতন আসিয়া গৃহ-দ্বারে দাঁড়াইল। যোগেশবাবু কহিলেন, "কেবে, রতন এলি?"

"আমিই এসেছি, হুজুর," বলিয়া রতন জোড়হস্তে প্রণাম করিল।

যোগেশ। ঘরের ভিতর আয় রতন।

যোগেশবাবুর কোমল স্বর রতনের প্রাণে একটা বিরাট বিস্ময়ের উৎপাদন করিয়া দিল। আসিবার সময় রতন মনে করিয়াছিল যে, যোগেশবাবুর ক্রোধাগ্নি বুঝি বা তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও সে যোগেশবাবুর এ আহ্বানকে উপেক্ষা করে নাই। কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই রতন এ বিপদের সম্মুখীন হইতে সাহস করিয়াছিল।

রতনকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া যোগেশবাবু কহিলেন, "চুপ ক'রে কি ভাবছো রতন?"

ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া রতন কহিল, "হুজুর এখন যে ভাবে কথা কইছেন, এতে কি ভাব্‌বার কিছুই নেই ?"

যোগেশ। তা' খুবই আছে রতন। কিন্তু বিস্মিত হ'বার মত কিছুই নেই। স্পর্শগুণে লোহাও যে সোণা হয়। একথা ত জান তুমি। তোমাদের আচার্য্যঠাকুরের চিন্তায় এ কয়েকদিনে আমি যে সোণা হ'য়ে গেছি।

রতন। আমিও সেই কথাই ভাব্‌ছি হুজুর !

যোগেশ। তোমরা নাকি সব এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছ ?

রতন। না গিয়েই বা কি করি হুজুর !

যোগেশ। না রতন—এমন ক'রে তোমরা চলে যেওনা। বোন্‌টিকে নিয়ে মা ত বহু পূর্ব্বেই চলে গেছেন—অনিল, রমাও আমার কাছ ছেড়েছে—ডাক্তারসাহেব আর এখানে নেই—তোমাদের আচার্য্যও শুন্‌ছি এ দেশের মাটীতে আর পা ছোঁয়াবেন না—সকলের শেষে—বরেনও আমাদের ত্যাগ করে গেল। তোমরাও যদি চলে যাও, আমি কাদের নিয়ে এখানে থাক্‌বো রতন ?

রতন দেখিল যোগেশবাবুর নয়ন দুটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কহিল, "আপনি এত বড় অপরাধ কর্‌তে পারেন না, একথা আমি খুবই জান্‌তুম। কিন্তু দোষ ত সব আপনারই।"

যোগেশ। হাজার বার সে কথা স্বীকার কচ্ছি রতন। চল, আমরা সকলে মিলে আচার্য্যকে ফিরিয়ে এনে আবার এই নন্দনপুরে প্রতিষ্ঠিত করি। পায়ে ধ'রে কাঁদলেও কি তিনি আস্‌বেন না ?

রতন। ডাক্‌বার মত ডাক্‌তে পার্‌লে ভগবানকে স্বর্গ থেকে টেনে আনা যায়! আচার্য্যঠাকুর আর.না আস্‌বেন কেন?

যোগেশ। তবে তাই চল রতন। কালই রওনা হই! মহাতীর্থ কাশীধামে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে, নূতন প্রাণে আবার এখানে ফিরে আসি।

রতন বুঝিল যোগেশবাবু একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। উদ্দেশে ভগবানকে নমস্কার করিয়া সে ভাবিল—এমনি ক'রে পাপীর মনে পুণ্য-প্রবাহ ছুটিয়ে দিতে পার বলেই ত' তোমাকে পাতকী-তারণ বলা হয় ভগবান! প্রকাশ্যে কহিল, "আমি সব সময়েই প্রস্তুত। ডেকে পাঠালেই সঙ্গে যাব।"

যোগেশ। এখন তবে এসো রতন।

কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া রতন বাহিরে চলিয়া গেল।

বিন্দুরাণী গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "চল, আমরা আচার্য্য ঠাকুরের নিকটে যাই। এত মহৎ তিনি যে, সব কথা শুনে, নিশ্চয়ই আমাদের মাপ করবেন।"

যোগেশবাবু কহিলেন, "আমি আগে ক্ষমা নিয়ে আসি। তা'র পর তুমি যাবে।"

———

৪৪

কাশীর নূতন বাড়ীতে অথিতিরূপে আচার্য্যকে পাইয়া সরযূর আনন্দের সীমা রহিল না। পার্শ্বের একখানি বাড়ীতে সপরিবারে বিজয়বাবু ও অন্য একখানায় মিঃ মুখার্জ্জি আসিয়া উঠিয়াছেন।

এবার বিজয়বাবু হেমলতাকে যেন নূতন করিয়া পাইলেন। এ'তো সেই বিলাস-পরায়ণা, আত্ম-চিন্তা-বিভোরা লীলাময়ী হেমলতা নহে, এ যে এক সেবা-পরায়ণা স্নেহ-শালিনী মূর্ত্তি। বিজয়বাবু বুঝিতে পারিলেন না কোন্ যাদুকরের মায়া-যষ্টি স্পর্শে হেমলতার এ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল।

যে মোহমায়ায় হেমলতা এতদিন আচ্ছন্ন ছিলেন, রমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাহা একেবারেই দূর হইয়া গিয়াছে। শক্ত করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইতে পারা যায় এমন একটা অবলম্বন না পাইয়া হেমলতা এতদিন প্রবৃত্তির উদ্দাম স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। করিবার মত একটা কোন কাজ না পাইয়াই— তিনি যাহা করিবার নয় তাহাই করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আত্ম-সেবা ও আত্ম-পরিতুষ্টির জন্য চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় সংসারের অন্য কার্য্যের সন্ধান তিনি করেন নাই বা কেহ তাঁহাকে সে সন্ধান প্রদান করে নাই। আচার্য্যের কঠোর সাধনা ও অলৌকিক সহিষ্ণুতার কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার প্রাণ আত্ম-চিন্তা ত্যাগ করিয়া জগতের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতি ধাবিত

হইল। দরিদ্র সেবায় রমার আগ্রহ দেখিয়া তিনিও এ অভিনব পথটা শান্তির স্থল বলিয়া মনে করিয়া লইলেন।

এখন তিনি বুঝিলেন, আত্ম-সুখ-চিন্তায় একটা জ্বালাময় দাহ নিয়ত প্রাণের মধ্যে নূতন অশান্তির সৃষ্টি করে, কিন্তু পরের শুভ কামনা প্রাণের মধ্যে স্থান পাইলে ত সে অশান্তির চিহ্নও থাকে না।

উচ্ছ্বসিত প্রাণের আবেগকে রুদ্ধ করিয়া ধীর শান্ত পদ-বিক্ষেপে সংসার পথে বিচরণ করাই যে শান্তি লাভের একমাত্র উপায় তাহা এখন তিনি ভাল রকমেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

বিলাস-সহচররূপে বিজয়বাবুকে তিনি যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, এখন আর তাঁহার সে দৃষ্টি রহিল না। তিনি বিজয় বাবুকে এতদিন পরে ঠিক স্বামী রূপেই বুঝিয়া পাইলেন। প্রবৃত্তির চঞ্চলতায় নরেশ সম্বন্ধে যে একটা ক্ষণিক পাপ-চিন্তা তাঁহাকে কয়েক দিনের জন্য ভিন্ন পথে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল, তিনি এখন বুঝিলেন, তাঁহার সে দুর্ব্বলতা প্রকৃত পক্ষেই অমার্জ্জনীয়-অপরাধ। জীবন-ব্যাপী-প্রায়শ্চিত্তে তিনি সেই অপরাধের ভার লঘু করিতে মনস্থ করিলেন।

ভগবানকে তিনি এতদিন ভাল করিয়া স্মরণ করেন নাই, কিন্তু এখন সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া তিনি ভগবানকে ডাকিতে শিখিলেন, ভগবানের অসীম অনুগ্রহের ছায়া তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অগ্নি-দগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় মলিনতা শূন্য হইয়া উঠিলেন।

সন্ধ্যার পর একদিন বিজয়বাবুকে হেমলতা বলিলেন, "রমার মাসিমার উইলের কথা বোধ হয় তুমি শুনেছ। পরের সেবায় সর্বস্ব উৎসর্গ ক'রে তিনি সন্ন্যাসিনীর ন্যায় জীবন যাপন কর্‌তে ইচ্ছা করেছেন। সকল কাজের ভার দিয়েছেন শচীনের উপর। আমাদের রমা-ভাণ্ডারেও তিনি একলক্ষ টাকা দান করেছেন। কাশীতে একটী অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'বে। আর একটি আশ্রম হ'বে সংসারে যে হতভাগিনীদের কেউ নেই তা'দের জন্য।"

বিজয়বাবু। দু'টোই খুব ভাল কাজ। বিশেষ শেষেরটা। যে সমস্ত রমণী ক্ষণিক মোহের উত্তেজনায় পথ-হারা হ'য়ে পড়ে কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হয়, তা'দের হাতে ধরে তোল্‌বার ত হিন্দু সমাজে কেহই নাই। একবারের একটা অপরাধের জন্য সৎপথে ফিরে আসবার অধিকার যে তা'রা চিরতরে হারিয়ে ফেলে। সরযূর এই আশ্রমে ত সেই সমস্ত রমণীরা ভুল সংশোধনের পর একটু শান্তিতে থাকৃতে অবসর পাবে। পবিত্রতার দোহাই দিয়ে হিন্দুসমাজ নরকের পথ প্রসারের যে সুবিধা ক'রে দিচ্ছেন সে নরক-রাজ্যের প্রভাব অন্ততঃ কিছু ত কমিয়ে দিতে পার্‌বে।

বিজয়বাবুর কথায় হেমলতার প্রাণটা যেন একবার কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "যে সমস্ত রমণীরা এম্‌নি অপরাধ করে তা'রা খুব দয়ার পাত্র!"

বিজয়বাবু। সে বিষয়ে ত সন্দেহ নেই হেম! ইচ্ছাকৃত

অপরাধ ভিন্নও ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যায় ভাবে উৎপীড়িত বহু হিন্দু রমণী সমাজে স্থান পায় না। সমাজের ভাগ্য-বিধাতারা জোর ক'রে তা'দের নরকের পথে ঠেলে দেয়। এ আশ্রম সে হিসাবে ও খুব প্রয়োজনে লাগ্‌বে।

হেমলতা। এত অল্প বয়সে সরযূর প্রাণে এত বড় সব মহৎ কাজের কল্পনা কেমন ক'রে যে ঠাঁই পেয়েছে তা' ত বুঝি না। বিপুল অর্থ পরের জন্য এমন ভাবে অর্পণ কর্‌বার শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে।

বিজয়বাবু। এই ত অর্থের সদ্ব্যবহার হেম! সন্তানহীন একটি বিধবার উপযুক্ত খরচের সংস্থান রাখিয়া বিশ লক্ষ টাকা যে দেশের কাজে দান করে, তা'র পুণ্য-স্মৃতি প্রাণে উঠ্‌লেও দেহ মন পবিত্র হয়। আর ঠিক লোক বেছেই কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। শচীনকে যেন এ জগতের মানুষ বলেই বোধ হয় না। এমনি একটা মহৎ ভাব তা'র প্রতি কার্য্যেই পরিস্ফুট হয়, যা'তে তা'কে দেবপুত্র ভিন্ন আর কিছুই কল্পনা করা যায় না।

হেম। আচার্য্যঠাকুর, শচীন, দীপ্তি, তৃপ্তি সবই যেন ভগবানের অদ্ভুত সৃষ্টি। এরা সকলেই যেন বিধাতার অনুগ্রহের ন্যায় আকাঙ্ক্ষার জিনিষ।

বিজয়বাবু। অনিলকে আমি শচীনের হাতেই সঁপে দিয়েছি। পিতা হ'য়ে তা'কে যে শিক্ষা না দিয়েছি, বন্ধুরূপে শচীন তা'কে অনেক বেশী শিখিয়েছে।

হেম। অনিলের সঙ্গে বিমলকেও আমি শচীনের শিষ্য ক'রে দিয়েছি। এ কয়েক দিনের পরিচয়েই বিমল শচীনের বিশেষ ভক্ত হ'য়ে উঠেছে। লেখাপড়া বিমলের বিশেষ হ'বে ব'লে বোধ হয় না। শচীনের সঙ্গে থাক্‌লে প্রাণটা যে তা'র উন্নত হ'বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিজয়বাবু। একটা কথা এখনও তোমাকে বলা হয়নি হেম! মিঃ মুখার্জ্জির ভগিনী লীলাকে তুমি কেমন মনে কর? তা'র সঙ্গে অনিলের বিবাহ দিচ্ছি। মুখার্জ্জির পত্নী বলেন—এ বিবাহে অনিল ও লীলা উভয়েই সুখী হ'বে, সে পরিচয় তিনি পেয়েছেন। এ বিবাহে আমি আর একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর্‌তে চাই। মিঃ মুখার্জ্জির মত দেশ-সেবাপরায়ণ লোককে সমাজের বাইরে রাখা সমাজের পক্ষে দুর্ভাগ্য। সমাজের অলঙ্কার যা'রা—তাদেরই যদি এম্‌নি ভাবে অবহেলা করা হয়, তবে যে সে সমাজের সৌন্দর্য্য কেমন ক'রে বজায় থাকে, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। এ প্রস্তাবে শচীনের আগ্রহ খুবই আছে। একবার আচার্য্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রে দিন স্থির কর্‌তে হ'বে।

হেম। সমাজের শুভ অথবা অশুভের কথা আমি বুঝি না। তবে এইটুকু বুঝি যদি বধূবেশে লীলাকে আমাদের বাড়ীতে আন্‌তে পারি, তবে বাড়ীর সৌন্দর্য্য শত গুণে বেড়ে যাবে।

বিজয়বাবু ও হেমলতা যখন এই বিষয়ে আলোচনা করিতে-ছিলেন, সেই বাড়ীরই অপর অংশে তখন আরও একটা কাজ চলিতেছিল।

সরযূর প্রদত্ত অর্থে, শচীন কাশীতে একটি অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছিল। একটি অনাথ শিশু ইহার মধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে।

শচীন, অনিল ও বিমল আশ্রম প্রতিষ্ঠার হিসাব করিতে ব্যস্ত। আর রমা অনাথ শিশুটিকে কোলে করিয়া, তা'র নিদ্রার ব্যবস্থা করিতেছিল। শিশুটি কিন্তু কেবলই মাথা তুলিয়া রমার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিতে হাসিতে আকুল হইয়া উঠিতেছে।

রমার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, সে অনিলকে বলিল, "চেয়ে দেখ দাদা, এ কুড়ুনো ছেলের আবদারটা। কত চেষ্টা কচ্ছি, কিছুতেই ঘুমুবে না।"

রমা শিশুটিকে দুই হাতে করিয়া উপরে তুলিল। যত্নের সহিত মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "বাপ-মা-হারা বাছারে আমার! ঠিক মায়ের স্নেহটুকু না পেলেও আমাদের কাছে তোর যত্নের অভাব হ'বে না।"

অনিলের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে শচীন বলিল, "মাতৃত্বেই রমণীর পূর্ণ বিকাশ। রমা এখনও কুমারী। কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি কৌশল এমনই বিচিত্র যে এই বালিকার হৃদয়েও, তিনি মাতৃত্বের বীজ রোপণ ক'রে রেখেছেন।"

রমা কহিল, "অনাথ-আশ্রমে এমন ধারা অনেক ছেলে মেয়ে এসে জুটবে, না দাদা? তখন এদের দেখ্‌বে কারা?"

অনিল। আমি ও সব জানিনি। বল না, শচীন দা'।

শচীন। সে বন্দোবস্ত এখনও ঠিক করা হয় নি। বন্দো-

বস্তের পূর্ব্বেই যদি বেশী ছেলে মেয়ে এসে পড়ে তার কতক ভার আমার দুই বোন ও তোমার মাসীমার উপর পড়বে। প্রয়োজন হ'লে তোমার মা আর রমাকেও সে ভার কিছু কিছু বহন কর্‌তে হ'বে। কেমন রমা, পারবে ত?

রমা উৎসাহের সহিত কহিল, "এ রকম কাজে ভারি আনন্দ। যা'দের প্রতি চেয়ে দেখ্‌বার কেউ নেই—সেই অনাথ শিশুগুলিকে একটু আদর যত্ন কর্‌তে পেলে প্রাণের মধ্যে যে আনন্দের উদয় হয়, তা'তো ত ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।"

শচীন কহিল,—"এ শিক্ষা তুমি কোথায় পেলে রমা? অনাথ আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে পারলেই বুঝি আশ্রম স্থাপন সফল হবে।"

"তাই হবে দাদা! রমাকেই আমরা অনাথ-আশ্রমের দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত কর্‌বো। বিজয়বাবু ও বাবার সঙ্গে আজ সে কথাই হ'য়ে গেছে। রমা যে এখন সকল রকমে আমাদের দাদা!" বলিয়াই দীপ্তি রমার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

দীপ্তি যে কখন আসিয়া গৃহ-দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল তাহা কেহই জানিতে পারে নাই।

শচীন কহিল, "কখন এলে দীপ্তি?"

দীপ্তি। গিন্নিমার সঙ্গে খাণিকক্ষণ আগে এখানে এসেছি। তোমাকে এখনি একবার বাড়ী যে'তে হবে। নন্দনপুর থেকে বরেনবাবু এসেছেন। এসেই তিনি দিদিমার পা জড়িয়ে পাগলের মত বলছেন যে বাপের অপরাধের জন্ত তাঁকে

প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হ'বে। প্রায়শ্চিত্ত যে কি তা' আমি এখনও জানি না। আর গিন্নি-মাও আমাকে সব কথা বলেন নি। বোধ হয় তিনি সে বিষয়ের পরামর্শের জন্যই অনিলের বাবার কাছে এসেছেন। মাসীমা অনেক চেষ্টায় বরেনবাবুকে শান্ত করে রেখেছেন।

শচীন। এখন আর হিসাব করা চল্‌ছে না অনিল। চল সকলে মিলে গিন্নিমা কি বলেন শুনে আসি।

সকলে প্রস্থান করিলে, দীপ্তি রমাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, "অনেক দিন থেকে যে আশা হৃদয়ে পোষণ করে আস্‌ছি, আজ বিজয়বাবু ও বাবার কথায় সে আশা আমার পূর্ণ হ'য়েছে। তুমি সকল রকমেই দাদার সহধর্ম্মিণী হ'তে পার্‌বে রমা!"

রমা সলজ্জভাবে কহিল, "তোমরা এত বড়, এত মহৎ যে, তোমাদের পায়ের কাছে দাঁড়াতেও আমরা সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ি।"

দীপ্তি আদরের সহিত রমার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "তোমার সে সঙ্কোচ আর থাক্‌তে দিচ্ছি না। পায়ের কাছে নয় রমা, এখন থেকে আমাদের প্রাণের মধ্যেই তোমার স্থান।"

৫৫

আচার্য্য কহিলেন, "সরযূ, মা আমার! তোর মধ্যে যে মা নামের পূর্ণ সার্থকতা দেখ্‌তে পাচ্ছি। সহস্র সন্তানের প্রতি-পালনের ব্যবস্থা ক'রে তুই যে জগজ্জননী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিস।"

সরযূ ধীরভাবে বলিলেন, "আপনি আমাকে মা ব'লে ডাকেন. এর চেয়ে বেশী গৌরব ত আর কিছু নেই।"

আচার্য্য। আমি ত তোর একটা বুড়ো ছেলে। আর ক'দিনই বা মা বলে ডেকে তোর গৌরব বৃদ্ধি কর্‌বার অবসর পাব? মা-হারা বহু শিশু যে তোর কোলে এসে মায়ের স্নেহ ফিরিয়ে পাবে। দেখিস্ মা, বেশী ছেলে মেয়ে পেয়ে যেন সন্তান-গুলির প্রতি অশ্রদ্ধা না আসে।

সরযূ। আমার ত কোন দোষ গুণ নেই ঠাকুর। সবই আপনার শিক্ষার ফল। আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন যেন আপনার উপদেশ ভুলে না যাই।

বিজয়বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া আচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সরযূকে কহিলেন, "আমাকে ত কোন কাজের ভার দিলে না সরযূ?"

সরযূ। যাঁ'দের হাতে কাজের ভার দিয়েছি, তাঁ'রা সে আপনার ও ডাক্তারসাহেবের পরামর্শ নিয়েই কাজ কর্‌বে। ঠাকুর মশায় রইলেন সকলের উপরে।

বিজয়বাবু আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "একটা কথা কয়েকদিন থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো ভাব্‌ছি ঠাকুর,—দেশের লোকের পরম বন্ধু যাঁরা, সমাজ কেন তাঁ'দের পরিত্যাগ ক'রে?"

আচার্য্য। দেশের কাজে যাঁ'রা প্রাণ সমর্পণ ক'রেছেন তাঁদের আদর্শ যে অতি উচ্চ। সমাজ তাঁ'দের পরিত্যাগ কর্‌লেও তাঁরা সমাজকে পরিত্যাগ করে না। অকাতরে সমাজের উপেক্ষা সহ্য করে, সেই সমাজের জন্য তাঁ'রা যে প্রাণপাত কর্‌তে প্রস্তুত। আমাদের ডাক্তারসাহেবের কথা মনে করেই দেখনা কেন? সমাজের মঙ্গলের জন্য তিনি কত কি কর্‌ছেন, তবু ত সমাজ তাঁ'কে কোলে তুলে নিচ্ছে না।

বিজয়বাবু। সমাজের পক্ষে এ ব্যবহারটা বড়ই লজ্জার বিষয় নয় কি?

আচার্য্য। এক হিসাবে খুবই লজ্জার বিষয়!

বিজয়। যদি কেউ সমাজের এ অন্যায় শাসন না মেনে চলে, তবে তা'র কি কিছু অপরাধ হয় ঠাকুর?

আচার্য্য। অনেকে ইহাকে সৎ-সাহস বলে। কিন্তু একটা চিরপ্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে, নূতনভাবে কাজ কর্‌তে গেলে অনেক চিন্তা ক'রে পদ বিক্ষেপ কর্‌তে হয়। সমাজের লাভ ও ক্ষতির দিকে একবার ভাল ক'রে দৃষ্টি কর্‌তে হয়। বর্ত্তমানে সামান্য একটু অসুবিধা হ'লেও যদি পরিণামে স্থায়ী সুফলের আশা থাকে, তবে সে কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত। বহুদিন থেকে যে নিয়ম চলে আস্‌ছে, হাজার হাজার লোক যে নিয়মের অধীনে

থেকে সন্তুষ্ট, তার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু ভাল আছে, যা'তে সে নিয়মকে লোকে ত্যাগ করেনি। ভাল কিছু না থাকলে সে নিয়মকে বহুদিন কেহ মেনে চল্‌তো না।

বিজয়। আমি মনে করেছি মিঃ মুখার্জ্জির ভগিনীর সহিত অনিলের বিবাহ দিব।

আচার্য্য। প্রাণ থেকে যদি তোমার এ কথা উঠে থাকে—সমাজের মঙ্গল হ'বে বলে যদি তুমি ঠিক বুঝে থাক, তবে এতে নিষেধ করবার ত কিছুই নেই।

বিজয়। আপনার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ না পেলে ত এ কাজে হাত দিতে পারি না।

আচার্য্য। আমার আশীর্ব্বাদ ঠিকই পাবে। তবে আর একটু ভেবে এ কথাটার মীমাংসা করতে চাই।

পরক্ষণেই বরেনকে সঙ্গে লইয়া আনন্দময়ী সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বরেনের দিকে চাহিয়া আচার্য্য স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এ যেন অন্য একটি মানুষ। বলিলেন, "এমন শুষ্ক মলিন মুখ কেন বাবা ?"

অনেক কথা বরেনের বলিবার ছিল। কিন্তু কেন যে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, সে তাহা বুঝিতে পারিল না। কেবল উদাস দৃষ্টিতে আচার্য্যের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আনন্দময়ী একটু অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "বরেনকে আজ তোমার কোলে তুলে দিতে এসেছি বাবা! বল তাঁকে কোল ছাড়া করবে না। ছেলের দিকে চেয়ে বাপের অপরাধ ভুলতে পারবে কি ?"

আচার্য্য বরেনকে কাছে বসাইয়া বলিলেন, "মানুষের লক্ষ অপরাধ সত্ত্বেও যখন ভগবান মানুষকে কোলে স্থান দেন তখন মানুষের দু'একটা অপরাধের জন্য মানুষ কি মানুষকে কোল ছাড়া করতে পারে বাবা ?"

আনন্দময়ীকে বলিলেন, "আমার কাছে কেন মা তুমি এত সঙ্কুচিতা হ'য়ে দাঁড়াও ?"

আনন্দময়ী। তোমার কাছে দাঁড়াতে গেলেই যে লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে যায়। সঙ্কোচের হাত আর এড়াই কেমন ক'রে বল ?"

বরেন অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিল, "আমার প্রায়শ্চিত্তের কি হ'বে ঠাকুর ?"

"আমার নিজের প্রায়শ্চিত্ত আমি নিজেই করতে এসেছি বরেন ; তোমাকে আর সে ভাবনা ভাবতে হ'বে না," বলিয়া যোগেশবাবু গৃহ-দ্বারে দাঁড়াইলেন। ডাক্তারসাহেবও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

আনন্দময়ী আগ্রহের সহিত যোগেশবাবুর হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "আয় যোগেশ ! এতদিনে ভগবান তোকে সুমতি দিয়েছেন। আচার্য্যের পদস্পর্শে তোর সব পাপ ধুয়ে মুছে যা'বে।"

৪৬

নিজের অপরাধ বুঝিয়া মানুষ যখন অনুতপ্ত হয়, তখন বুঝি তাহার প্রাণে কালিমার চিহ্নটুকুও থাকে না। যোগেশবাবু কহিলেন, "আমার অপরাধ এত বেশী যে, সে অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌তেও আমার সাহস নেই মা!"

আচার্য্য কহিলেন, "অপরাধের কোন চিহ্নই ত আজ তোমার মুখে চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি না যোগেশবাবু! নব-পল্লবিত বৃক্ষের মত তোমার এ নূতন মূর্ত্তি আজ বড়ই মনোরম বলে বোধ হচ্ছে। মেঘ কেটে গেলে আকাশ যেমন নির্ম্মল হয়, তুমিও যে ঠিক তেম্‌নি ভাবে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছ যোগেশবাবু!"

যোগেশবাবু লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিতেছিলেন না। বলিলেন, "কি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লে আমার এ অপরাধের ভার কমে যাবে, তা' তো আমি বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না ঠাকুর!"

আচার্য্য উঠিয়া যোগেশবাবুকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, "প্রাণের কালি মুছে ফেল্‌বার এমন আর কি আছে?"

যোগেশবাবু কহিলেন, "আমাকে হৃদয়ে স্থান দিলেন কিন্তু আমি যে আপনার চরণ স্পর্শ কর্‌বারও অযোগ্য। এতই যদি অনুগ্রহ প্রকাশ কর্‌লেন, তবে আমার আর একটা ভিক্ষা পূর্ণ কর্‌তে হ'বে। বরেনের বিনিময়ে মা-লক্ষ্মী তৃপ্তিকে আমি ঘরে তুলে নিতে চাই। এ অনুমতি আমাকে প্রদান করুন।"

আনন্দময়ী আগ্রহের সহিত বলিলেন, "তাই কর বাবা! এতেই আমার যোগেশের সব পাপ দূর হ'য়ে যাবে।"

দূরে তৃপ্তি দাঁড়াইয়াছিল। আনন্দময়ী তাহাকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া আচার্য্যকে বলিলেন, "তোমার এ মেয়েটি আমার বরেনকে দিতেই হ'বে। তা' হলেই বুঝ্বো, তোমরা যোগেশের সব অপরাধ ভুল্তে পেরেছ।"

আচার্য্য দীপ্তির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি বলিস্ মা?"

দীপ্তি কহিল, "গিন্নি-মা যখন চাইছেন, তৃপ্তিকে আর ত আমরা রাখ্তে পারি না বাবা! তবে তৃপ্তিকে আমরা অম্‌নি দিচ্ছি না।"

দীপ্তি রমার হাত দু'খানি ধরিয়া কহিল, "আমরা দরিদ্র। রমাকে আমাদের কুটীরে এ'নে আমরা চির ঐশ্বর্য্যশালী হ'ব। কেমন গিন্নি-মা, এতে আপত্তি নেই ত?"

বিজয়বাবু কহিলেন, "ঠাকুর ত পূর্ব্বেই সে অনুমতি দিয়েছেন। বহুপুণ্য করেছিল রমা, তাই তা'র এ সৌভাগ্য।"

আচার্য্য ডাক্তারসাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ বড়ই আনন্দের দিন ডাক্তারসাহেব! ভগবানের আশীর্ব্বাদ যেন চারিদিকে ছড়ানো দেখ্তে পাচ্ছি। এ আশীর্ব্বাদের মাঝ-খানে আপনাকে আর পর ক'রে রাখ্তে পাচ্ছি না।"

ডাক্তারসাহেব। আপনাকে যে আমি নিতান্ত আপনার বলে মনে করি ঠাকুর!

আচার্য্য। আপনার পত্নী ও ভগিনীকে আন্‌বার জন্য শচীন

এখনি যাচ্ছে। এ আনন্দের দিনটা একত্রে যাপন কর্‌বার ইচ্ছা আমি কিছুতেই চেপে রাখ্‌তে পাচ্ছি না। পুষ্প যেমন বৃক্ষের শোভা বাড়িয়ে দেয়, আপনার নিঃস্বার্থ কাজগুলিও সমাজকে তেম্‌নি ভাবে অলঙ্কৃত ক'রে রেখেছে। আপনাকে বাদ্ দিয়ে সমাজটাকে ভূষণহীন করা, বড়ই যে অবিবেচনার কাজ হ'বে ডাক্তারসাহেব!

ডাক্তারসাহেব। আমার পত্নী ও ভগিনীকে আন্‌তে লোক পাঠাবার দরকার হ'বে না। তা'রা যে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

আচার্য্য। এতক্ষণ এ কথা বলেন্‌নি কেন, ডাক্তার সাহেব?

সরযূ কাল বিলম্ব না করিয়া বাহির হইতে বেলা ও লীলাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

লীলার হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া রমা কহিল, "আর ত তোমাকে ছাড়্‌বো না। আজ থেকে তুমি আমাদের।"

লীলার মুখখানি লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। বেলা কহিলেন, "আজিকার এ উৎসব একটা চিরস্মরণীয় স্মৃতি—মানুষের মধ্যে এত উদারতা থাকতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস ছিল না।"

আচার্য্য। বিস্মিত হচ্ছ কেন মা! মানুষ মানুষকে কোলে তুলে নিচ্ছে এর মধ্যে আবার উদারতা কি?

রতন এতক্ষণ চুপ করিয়া যোগেশবাবুর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া-

ছিল। আচার্য্যের কথা শেষ হইতেই বলিল, "ডাক্তারসাহেব বিলেত গিয়েছিলেন ব'লে তাঁ'র জাত্‌টা ছোট হ'য়ে যায়নি। বরং তিনি নিজের জাত্‌টাকে আরও বড় ক'রে ফিরে এসেছেন। আমার ত মনে হয়, আমাদের গ্রামে যে সব ব্রাহ্মণ আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকের পায়ের ধূলো না নিয়ে, এ ডাক্তারসাহেবের পায়ের ধুলো গায়ে মাখ্‌লে শরীরটা আরও পবিত্র হয়।"

আচার্য্য কহিলেন, "রতন তোর ঋণ জীবনে শোধ হ'বে না। গ্রাম এখন তোদের হাতেই রইল। জীবনের বাকী কয়েকটা দিন বিশ্বেশ্বরের চরণতলে প'ড়ে কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করেছি।"

রতন। সে কথাটী বল্‌বেন না ঠাকুর! আপনাকে ফেলে চলে যাব বলেই কি সকলে মিলে এখানে এসে জুটেছি?

যোগেশবাবু। ঠিক বলেছ রতন! ঠাকুর আমাদের জয়-পতাকা। নন্দনপুরে এ জয়-পতাকা প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে না পার্‌লে আমাদের সমস্তই যে বৃথা।

আচার্য্য কহিলেন, "এ শুভ পরিবর্ত্তন তোমারই ইচ্ছা ভগবান্! কি কৌশলে কর্ম্ম-স্রোত কোন দিকে ধাবিত হয়, তা' যে মানব-বুদ্ধির অগম্য!"

উপস্থিত সকলেই যুক্ত-করে ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন।

সমাপ্ত।